হারুন ফেরেনি

রিজিয়া রহমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটমামা
মরহুম সারোয়ার আলম শ্রদ্ধাস্পদেষুর
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—শুনেছো, হারুণ ফেরেনি এখনও!

হারুণের মা মাহমুদা ঘড়ি থেকে চোখ ফেরালেন। তাকালেন রফিক সাহেবের দিকে। স্ত্রীর উদ্বেগে কোনোই জবাব দিলেন না তিনি। রাত মাত্র বারোটা। হারুণ কবেই বা ফেরে সময়মতো! মাঝে মাঝে দু'চার সপ্তাহ তার খোঁজ থাকে না। নতুন করে ভাববার কি আছে! ঘরে আলো জ্বলছে। মাহমুদাই জ্বালিয়েছেন। সম্ভবত ঘড়ি দেখবার জন্য। চোখের ওপর হাত চাপা দিলেন রফিক সাহেব। মাহমুদা পানের বাটা খুললেন। আঙুলের ফাঁক দিয়ে মাহমুদার শুকনো চিন্তিত মুখটা দেখলেন রফিক। আজ দুপুরের পর থেকে তাকে বড় বেশি বিচলিত মনে হয়েছে। কি হয়েছে! হারুণের জন্য কেন নতুন করে ভাবছে!

—কখন বেরিয়েছে হারুণ? চোখ বন্ধ করে প্রশ্ন করলেন রফিক সাহেব।

—এই তো দুপুরে ঘুমোচ্ছিল। বলেছিল—মা খাবার সময় আমাকে ডেকে তুলো। না খেয়ে বেরিয়ে গেল।

মাহমুদার কথায় ঝলক দিল উদ্বেগ। বিচলিত হলেন না রফিক সাহেব। বললেন—ওর কথা বাদ দাও। নাও, আলোটা নিভিয়ে দাও। আমি ঘুমবো।

পানের খিলি হাতে নিয়ে উঠলেন মাহমুদা। আলো নিভিয়ে বারান্দায় এলেন। পাশের ঘরে রুনু ঘুমোচ্ছে। অনার্স পরীক্ষা সামনে। বাড়িতে লেখাপড়ার অসুবিধে হয়, হলেই থাকে। কালই এসেছে বাড়িতে। বইপত্র, কাপড়, জামা বিছানায় দুম করে ফেলে চেঁচামেচি করেছে অনেকক্ষণ—বছরে একশ'বার যদি ইউনিভার্সিটি বন্ধই থাকে, তাহলে আর পরীক্ষায় পাস করব কেমন করে! দু'টো পেপার মাত্র পরীক্ষা হয়েছে, তারপরই আবার বন্ধ।

রুনুর ভীষণ মেজাজ খারাপ। তিন বছরের অনার্স পরীক্ষা প্রায় পাঁচ বছরের কাছাকাছি এসেও শেষ হচ্ছে না। জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলতে তুলতে যেন দেয়ালের কাছে নালিশ করছিল রুনু—ইউনিভার্সিটি তো না, যেন ঈদের ছুটির লোক্যাল ট্রেন। চেইন টানলেই থেমে যাচ্ছে যখন তখন।

গত বছরের পরীক্ষায় রুনু ভালো করেনি। পাশের কামরায় বোমা ফাটার আওয়াজ, বাতাসে গোলাগুলির শব্দ আর বারুদের গন্ধ নিয়ে পরীক্ষার খাতায় কি কিছু লেখা যায়! এবার অবশ্য রুনু ঠিক করে ফেলেছে মন। হলের পাশে যদি ট্যাংকের গোলাবর্ষণও হয় তবুও পরীক্ষার খাতা থেকে চোখ তুলবে না। মায়ের কাছে এসব সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়ে মেজাজ ঝেড়েছিল মায়ের ওপরেই—তোমার আদরের ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস কোর, এরপর কি পরীক্ষার খাতা কলম নিয়ে যুদ্ধের ফ্রন্টে যেতে হবে নাকি!

রুনুর ঘরে এক পলক চোখ রাখলেন মাহমুদ। ওকে কি ডাকবেন। ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, হারুণ কেন ফিরতে দেরি করছে। সে তো বলে গিয়েছিল, এখুনি ফিরে আসছি মা! এসেই ভাত খাব।

রুনুর ঘরে এলেন মাহমুদা। টুক করে সুইচ টিপলেন। রুনু ঘুমোচ্ছে। ছোট্ট ঘরটায় রাজ্যের জিনিস। ট্রাংকের ওপর রুনুর বইখাতা, কাপড়-চোপড় ডাই করা। ভালো করে গুছিয়েও রাখেনি। ঝুনুর বিয়ের আগে ঝুনু-রুনু দু'বোন থাকত এ ঘরে। ঝুনুটা গোছানো ছিল। ছিমছাম পরিপাটি করে রাখত ঘর। খুব অল্প বয়সেই বিয়ে দিলেন রফিক মেয়েটার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোই হয়েছে। রুনুটারও যদি একটা ভালো সম্বন্ধ এসে যেত! রফিক সাহেবকে বললেই বলেন—অনার্স পরীক্ষাটা হয়ে যাক। খুব আস্তে নিঃশ্বাস ফেললেন মাহমুদা। কি যেন কবে শেষ হবে অনার্স পরীক্ষা।

ঘাড় গুঁজে ঘুমোচ্ছে রুনু। এলোমেলো চুল ছড়িয়ে আছে মুখে। মুখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে দিলেন মাহমুদা। মাথার বালিশ ঠিক করে দিলেন। আলো নিভিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় চোখ গেল হারুণের ঘরে। ঘরটা খালি। অন্ধকার। কখন ফিরবে হারুণ!

অন্ধকারে হেঁটে নিজের ঘরে এলেন মাহমুদা। বুকের ভেতর আনচান, অস্থিরতা তাকে কষ্ট দিচ্ছে। কষ্টটা হারুণের জন্য। ও তো বলেছিল ফিরবে। এমন তো ও বলে না। ইদানীং হারুণকে মাহমুদা প্রশ্ন করতেন না তার ফেরার সময় জানবার জন্য। আগে করতেন। হারুণ ক্ষেপে যেত—আমি কি বাবার মতো চাকুরে যে, ঘড়ি ধরে টাইম মতো বাড়ি ফিরব!

—কী কাজ তোর? কোথায় থাকিস? বইপত্র তো ছুঁয়েও দেখিস না।

ছেলেকে এরকম অভিযোগ করাও ছেড়ে দিয়েছিলেন মাহমুদা বেশ অনেক দিন থেকে। তবু জিজ্ঞেস করতেন—কখন ফিরবি হারুণ?

—জানি না। তোমার এসব প্যানপ্যানানি আমার ভালো লাগে না। কড়া রুক্ষ জবাব দিত হারুণ।

চোখের সামনেই ছেলেটা বদলে গেল। অচেনা অন্য কেউ হয়ে গেল। কেমন করে হলো! কেন হলো। প্রশ্নটা এতদিন পরে নিজেকেই করতে চাইলেন।

গলিতে গর্জনকারী হোন্ডার শব্দ চমকে দিল মাহমুদাকে। হারুণ কি ফিরল! বারান্দায় এলেন তিনি। হারুণের হোন্ডা নয়। গর্জন করতে করতে হোন্ডাটা চলে গেল দূরে! গলিতে পথচারীদের পায়ের শব্দ, মাঝে মধ্যে রিক্শার ঘণ্টা আর দু'একটা গাড়ি এখনও সচল রাতের খবর দিচ্ছে। এখুনি হয়তো ফিরবে হারুণ। রান্নাঘরে এলেন মাহমুদা। হারুণের ভাত তরকারি গরম করলেন। ধরে নিলেন, টেবিলে ওর খাবার রাখতে রাখতেই ফিরে আসবে। আজই হারুণ অনেকদিন পরে জিজ্ঞেস করেছিল—কি রান্না করছ মা?

রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল হারুণ। মুখটা খুব শুকনো ছিল। অন্যমনস্ক হয়ে কিছু ভাবছিল। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, হারুণকে বুকের কাছে এনে জিজ্ঞেস করেন—'হারুণ সত্যি করে বলতো বাবা, কি হয়েছে তোর! তোকে আজ অন্যরকম লাগছে। আমি খুশি হচ্ছি, আবার ভয়ও পাচ্ছি।'

হারুণের ঘরেই ঢুকে পড়লেন এখন। আলো জ্বালালেন। বিছানা এলোমেলো। বালিশটা মেঝেতে। ঘরের মাঝখানে স্যান্ডেলের একপাটি। টেবিলের ওপর দলা করা ভেজা তোয়ালে। ঝেড়েঝুড়ে গুছিয়ে রাখলেন মাহমুদা। কখন যে হুট করে এসে পড়ে ছেলেটা!

বিছানা ঝাড়তে ঝাড়তে মনে হলো, অনেকদিন মাহমুদা হারুণের ঘর ঘুছিয়ে দেননি। যেন অনেকদিন আসা হয়নি এ ঘরে। অথচ কালই তো...। হঠাৎ কোনো দুঃস্বপ্নের কথা মনে পড়ে যাবার মতো চমকে উঠলেন মাহমুদা। নাঃ ওসব কিছু না। কিছু না। হারুণ ফিরে আসবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই

রাস্তায় মানুষ চলাচল করছে না। নিঃশব্দ পথ। ঘণ্টাখানেক আগেও ওপরতলার বাড়িওয়ালার বাড়ির কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল। আলো জ্বলছিল সামনের বাড়িতে। এখন সব নিঃসাড়। অন্ধকার। ছায়া হয়েই অন্ধকার বারান্দায় হাঁটছেন মাহমুদা। বিছানায় শুয়ে মাহমুদার উদ্বেগ অনুভব করা যায়। ঘুম আসছে না। রফিক সাহেব বুঝলেন, হারুণের মায়ের মতো তাঁরও সমস্ত চেতনা উৎকর্ণ হয়ে আছে পথের দিকেই। হালকা মৃদু শব্দ হলো পাশে। চোখ খুললেন রফিক। মাহমুদা তাঁর খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। হারুণের মায়ের উদ্বেগ এখন উৎকণ্ঠার সীমানায় পৌঁছে গেছে। নিরুপায় এবং অসহায়ভাবে স্বামীর কাছেই আশ্রয়ের ভরসা খুঁজছেন।

— তুমি জেগে আছ?

মাহমুদা নিচু কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন। জবাব দিলেন না রফিক। বুকের ভেতর উদ্বিগ্ন আশংকা ভয়ার্ত ঝিলিক তুলছে। কিছুতেই সেটাকে তাড়িয়ে দিতে পারছেন না তারা। মাহমুদার মৃদু কণ্ঠ সেটাকে আরো জোরালো করে দিল। নিজের ওপরেই রেগে উঠলেন রফিক। স্ত্রীকে ধমক দিতে চাইলেন—যাও, বিরক্ত কোর না। মরুক। জাহান্নামে যাক। যা খুশি তা-ই হোক তোমার ছেলের।

কিন্তু পারলেন না এসব বলতে। ভারি গলায় প্রশ্ন করলেন—ক'টা বাজে?

—আড়াইটা! কিন্তু হারুণ তো ফেরেনি!

মাহমুদার কথায় প্রতিদিনকার খবর কাগজের পাতার যত যুবকের লাশের নিয়তির ভয় শীতের বাতাস হয়ে ছুঁয়ে দিল রফিক সাহেবকে। উঠে বসলেন তিনি। অন্ধকারেই যেন দেখতে পেলেন হারুণের মায়ের পোড়খাওয়া ভয়ার্ত, উদ্বিগ্ন দুঃখী মুখ। হারুণকে নিয়ে কোনোদিন অনেক বড় স্বপ্ন দেখেছিল কি না ওর মা, এখন সেটা মনে পড়ল না রফিক সাহেবের।

বাড়ির সামনের গলি থেকে ঠুং ঠাং শব্দ উঠল আচমকা। এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়ালেন মাহমুদা। তীব্র বাতাসের গতিতে চলে গেলেন বারান্দায়। ওখানে দাঁড়ালে গলির শেষ মাথা পর্যন্ত দেখা যায়। রফিক সাহেব উঠে পড়লেন। মাহমুদার পেছনে এসে দাঁড়ালেন।

—কে এলো? তাঁর উদ্বিগ্ন প্রশ্নের জবাবে কথা বললেন না মাহমুদা। রেলিংয়ে ঝুঁকে দৃষ্টি দিয়ে আধ-অন্ধকার গলিটাই হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। রফিক সাহেবের প্রশ্ন শুনতে পাননি। রফিক সাহেব কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ফিরে এলেন ঘরে।

মাহমুদা ফিরলেন না। বারান্দাটা এতই ছোট, আর সেখানে এত বাতিল জিনিস ডাই করা যে, তার মতো হালকা মানুষটিও দু'পায়ে ভালো করে দাঁড়াতে পারে না। এক পায়ে পুরো ভর রেখে রেলিংয়ে ঝুঁকে আছেন মাহমুদা। কোথায় শব্দ হলো! কে এলো! খুব স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না। ল্যাম্পপোস্টের ম্লান আলো ভিক্ষুকের মতো হাত বাড়িয়ে রেখেছে ডাস্টবিনের জঞ্জালে। এতক্ষণে দেখতে পেলেন মাহমুদা। একজন মানুষ আর একটি কুকুর একই সঙ্গে আবর্জনা ঘাঁটছে। ঠুং ঠুং ঢন্ ঢন্ শব্দ তুলে গড়িয়ে পড়ল কয়েকটা খালি পুরনো টিন। শব্দটা থেমে গেল একটু পরেই। দৃশ্যটা এত পুরনো যে, নতুন করে ওখানে দেখবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু নেই। মুখ ফিরিয়ে নিলেন মাহমুদা। বুকটা খাঁ খাঁ শূন্য মাঠ হয়ে গেল। ঘরে টিক টিক শব্দ তুলে ঘুরে চলেছে টেবিল ঘড়ির কাঁটা। প্রতি পলে আশংকার ককটেল ছুড়ে মারছে মাহমুদার বুকে। ভাঙাচোরা সরু গলি, গায়ে গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়া বাড়ি, আবর্জনার দুর্গন্ধ উড়িয়ে নিয়ে বুঝি হাওয়ায় মিলিয়ে দিল শেষ বসন্তের রাত।

উন্মনা হয়ে গেলেন মাহমুদা। মনে করতে চেষ্টা করলেন, কবে তিনি হারুণের কপালে কাজলের টিপ বসিয়ে বলেছিলেন—এই দিলাম কালির ফোঁটা আমার সোনার কপালে। কেউ আর বদনজর লাগাতে পারবে না। কবে তিনি হারুণের হাতে বই দিয়ে বলেছিলেন—'লক্ষ্মী বাবু, পড় তো স্বরে অ স্বরে আ...।' এই তো সেদিন! এই তো সেদিন তিনি হারুণকে বুকের কাছে নিয়ে রাজপুত্র আর দৈত্যের গল্পটা শুনিয়েছিলেন। এই তো, এখনি ছিল সে মায়ের কোলে। খুব হালকা নিঃশ্বাসের মতো দৃষ্টি দিয়ে সেই ছেলেটিকে গলিতে খুঁজলেন তিনি। গলি নিঃশব্দ। কুকুর আর মানুষও এখন শব্দ তুলছে না ডাস্টবিন থেকে। প্রতীক্ষার দৃষ্টি হয়ে ঝরছে পথে শুধু নিঃসঙ্গ ল্যাম্পপোস্টের আলো। যেন ওপথে কখনও কোনো বেপরোয়া যুবক উদ্ধত পায়ে হাঁটেনি। কোনো তাড়া খাওয়া ভীতসন্ত্রস্ত কেউ ওপথ দিয়ে ছুটে এসে বাড়িতে লুকিয়ে পড়েনি। গলির নিঃশব্দ আলোয় তাকিয়ে দু'চোখে পানি ভরে উঠল। কেন আজ এমন হচ্ছে মাহমুদার! হারুণ তো কতবার মাঝরাতে বাড়ি ফিরেছে। অথবা একেবারেই ফেরেনি। মাহমুদা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। রাগ করেছেন। কখনও লুকিয়ে কেঁদেছেন।

সেই যে সেবার। তিনচার দিন বাইরে কোথায় কাটিয়ে এমনি এক মধ্যরাতে হারুণ ফিরেছিল। ছেলের উগ্র চেহারা, লাল চোখ, এলোমেলো চুল আর জামাকাপড় দেখে ভয় পেয়েছিলেন মাহমুদা। তারপর একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিলেন ওর হাতে অস্ত্র দেখে। ভয় পেয়েছিলেন প্রচণ্ড। কোনো রকমে উচ্চারণ করেছিলেন—এ কি! তোর সঙ্গে এসব কি!

মায়ের ভয়ার্ত ভঙ্গিতে বিরক্ত হয়ে রুক্ষ জবাব দিল হারুণ—চেঁচামেচি কোর না। চুপ করে থাক। ভেতরে শক্তি খুঁজলেন মাহমুদা—হারুণ আমি বুঝতে পারছি না, কোথা থেকে কেন এসব নিয়ে এলি!

অস্ত্রশস্ত্র আলমারিতে তুলছে হারুণ। খুব অনায়াসে বলল—যেখান থেকেই আনি, সেটা তোমার জানবার দরকার নেই।

ছেলের মুখোমুখি হলেন মাহমুদা—কেন জানবার দরকার নেই। কে দিল এসব? এসবে কি দরকার তোর আমি জানতে চাই।

—বাঁচার জন্য দরকার।

—বাঁচার জন্য! কেন, আমরা কি সবাই মরতে বসেছি! দেশে কি যুদ্ধ শুরু হয়েছে!

—হ্যাঁ, হয়েছে। তোমরা মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিলে অথচ জান না, তারপর থেকেই চলছে ক্ষমতার যুদ্ধ। সেই যুদ্ধ তো অস্ত্রেরই। এটাই এখন রেওয়াজ।

—আমি বুঝতে পারছি না তুই কি বলছিস!

হারুণ বিশ্রী চিৎকার করে উঠল—উঃ তুমি যাবে এ ঘর থেকে?

ভীষণভাবে থমকে গেলেন মাহমুদা। কোথায় তার সেই শান্ত, ভদ্র, ভালো ছেলেটি! এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে? এক কি তিনি চেনেন! চেনেন না তো! মাহমুদা ভালো করে দেখলেন হারুণকে। রুক্ষ, উগ্র, বিকারগ্রস্ত ভঙ্গি হারুণের। মুখ ফিরিয়ে নিলেন দেয়ালের দিকে—তোর কি লাভ এতে?

—লাভ! অনেক লাভ। ক্ষমতাবানরা খাতির করে, মানুষ ভয় পায়, যা খুশি তা-ই করা যায়। পাওয়া যায়।

—হারুণ, তোর দু'চাচা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছে।

প্রচণ্ড হাসির শব্দে মায়ের দুর্বলতা উড়িয়ে দিল হারুণ—মা, তুমি অনেক পেছনে বসে আছ। তাই সামনেটা দেখতে পাচ্ছ না। চাচারা বেঁচে থাকলে এই অস্ত্রের লড়াই থেকে কি বাঁচত?

—কেন বাঁচত না! অনেকেই বেঁচে আছে। শুনে রাখ অনেকে বাঁচে, শুধু কেউ কেউ বাঁচে না।

হারুণ হেসে ফেলল—বাঃ চমৎকার কথা বলতে পার তো! তোমার বয়স আর শক্তি যদি থাকত, তোমাকে নামিয়ে দিতাম ময়দানে।

রাগ আর দুঃখ একই সঙ্গে আক্রমণ করল মাহমুদাকে—হারুণ, এসব জানলে, শুনলে তোর বাবা ভীষণ কষ্ট পাবে।

ছেলেকে দুর্বল করার জন্য না বুঝেই শেষ অস্ত্রটি নিক্ষেপ করলেন মাহমুদা।

হারুণ ঝাড়া দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। গনগনে রাগে মুখের রেখা জ্বলে উঠল তার—কষ্ট! কেন কষ্ট পাবে! বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে জেলখাটা তোমার ওই স্বামীকে বলে দিও, তার কষ্টটা শুধু বইপত্রেই লেখা আছে। আর কোথাও নেই।

—তুই অমানুষ হয়ে গেছিস। তুই আমার ছেলে এটা ভাবতেও আমার ঘেন্না হচ্ছে।

নিরুপায়ভাবে পরাজিত সংলাপেই আশ্রয় নিয়ে কেঁদে ফেললেন মাহমুদা।

সে কান্নাকে উপেক্ষা করল হারুণ—

কান্না তো মানুষের জন্য। অমানুষের জন্য নয়। আমার জন্য তোমার কান্নার প্রয়োজন এখন আর নেই।

অন্ধকার গলিতে ফিরলেন মাহমুদা। চোখ মুছলেন। সেই ঘটনা খুব নৈপুণ্যের সঙ্গেই স্বামীর কাছে গোপন করেছিলেন। আর মায়ের সীমানাতে বন্দি থেকেই হারুণকে অনুনয় করেছেন—এসব থেকে সরে আয় বাবা। ভালো হয়ে যা। আমার ভয় হয়...। মায়ের ভয় আর উপদেশকে অবলীলায় উড়িয়ে দিয়েছে হারুণ—ভালো মন্দ ওসব নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই আমার। ধরে নাও, আমি চাকরি করছি অনেক টাকার আর ক্ষমতার চাকরি। এর নেশা থেকে ফেরা যায় না।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন মাহমুদা, কত হলো রাত, এসব কিছুই মনে আনতে পারলেন না এখন। আবার শব্দ উঠল গলিতে। সমস্ত চেতনা উৎকর্ণ হলো। হারুণ কি ফিরল! এখনও সেই মানুষ আর কুকুর ডাস্টবিনের পাশে। অবসন্ন পা টেনে ঘরে ফিরলেন মাহমুদা।

তিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রফিক সাহেব বসে আছেন বিছানায়। মশারির ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করলেন—ফেরেনি হারুণ?

—না।

বারান্দা আর ঘরের মাঝখানে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন মাহমুদা। সেখান থেকেই জবাব দিলেন।

—ক'টা বাজে?

অর্থহীন আলাপে সময় কাটাবার মতো করেই কথাটা বললেন রফিক সাহেব। মাহমুদা নির্বাক। মনে হয় এ ঘরে তিনি নেই। তাঁর নিস্পন্দ, নিঃশব্দ ভঙ্গি শোকার্ত আবহাওয়া ছড়িয়ে দিচ্ছে সারা ঘরে। মশারির বাইরে এলেন রফিক সাহেব—কী হলো, কথা বলছ না কেন? ক'টা বাজে?

টেবিল ঘড়িটা আলোর সংকেত দিয়ে সময় জানিয়ে চলেছে সেটা যেন ভুলেই গেছেন রফিক সাহেব। আসলে তিনি চাইছেন মাহমুদা কথা বলুক। উদ্বিগ্ন আলোচনায় শঙ্কাকে তাড়িয়ে দিতে অগ্রণী হোক।

মাহমুদা মুখ তুললেন। খুব আস্তে বললেন—কী যেন ক'টা বাজে। ঘড়ি দেখ।

ঘড়িতে তাকালেন রফিক সাহেব। রাত তিনটের ঘোষণা ওখানে। রফিক সাহেব অস্থির বোধ করলেন। রাতের অতিক্রান্ত প্রহর ধরে পৃথিবীর যত দুঃসংবাদ যেন ছুটে আসছে এদিকে। এখানে। এই মধ্যবিত্ত শ্রীহীন পাড়ার বিবর্ণ ঘরে। উপায়হীন দুই মা-বাবাকে লক্ষ্য করে। অস্থির পায়চারী করলেন কিছুক্ষণ রফিক। রাস্তার ম্লান আলোর আভায় মাহমুদা চাইনিজ কালির অবয়বের আদলে ফুটে আছেন। দৃশ্যটা বুকে ঘা দিল। মনে হলো, ভয়ঙ্কর কিছু এখুনি ঘটে যাবে। বুকের ভেতরে ধাক্কা দিল ভয়। তাড়া খাওয়া মানুষের মতো সুইচ খুঁজলেন। আলো জ্বালিয়ে দিলেন। অন্ধকার সরে গেল। মাহমুদা তাকালেন রফিকের দিকে। দু'চোখে প্রশ্ন। আলনা থেকে শার্ট টেনে গায়ে দিলেন রফিক সাহেব। পা বাড়ালেন ঘরের বাইরের দিকে।

—কোথায় যাচ্ছ? মাহমুদা কাছে এসে দাঁড়ালেন।

—বাইরে।

উজ্জ্বল আলোর মতো দপ্ করে জ্বলে উঠল মাহমুদার মুখ। দৃষ্টিতে পথ খুঁজে পাবার আশা—হারুনের খোঁজে যাচ্ছ?

দাঁড়িয়ে গেলেন রফিক সাহেব। স্ত্রীকে নির্বোধ, অর্বাচীন স্ত্রীলোক বলে ধমক দিতে ইচ্ছে হলো। বুঝতে পারলেন, দুর্বোধ্য রাগ তার উপায়হীনতাকে দখল করেছে। বললেন—কাকে খুঁজব! কোথায় খুঁজব! সে তো অনেক আগে এ বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়েছে।

—কী বলছ এসব! আজই তো ও দুপুরে বাড়িতে ছিল।

—সে তো তোমার ছেলে। কিন্তু হারুণ নয়!

ভীষণ ভয় পাওয়া দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের রেখায় কিছু খুঁজলেন মাহমুদা—কী আবোল তাবোল বকছ! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে!

বিষণ্নতা ছড়িয়ে পড়ল রফিক সাহেবের ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে। দুঃখিত, পরাজিত মানুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো বললেন—হলেই বোধ হয় ভালো হতো।

ঘরের দিকে ফিরলেন তিনি। বুকের আশংকা হঠাৎ ড্রাম পেটাতে শুরু করল। কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু কি করবেন। কার কাছে যাবেন। কোথায় খুঁজবেন বাড়ি না ফেরা হারুণকে এতদিন পরে।

একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে হলো তাঁর। অনেকদিন সিগারেট ছেড়েছেন। সেই যখন চাকরি গেল তখন থেকে। তিক্ত হাসির সরু রেখা ঝিলিক দিল রফিক সাহেবের ঠোঁটের কোণে। ঘুষখোর জিএম যখন নিজের সুবিধের জন্য সৎ, কর্মপটু পুরনো অফিসার রফিক আহমদের চাকরি খেয়েছিল—তখন কীই-বা করতে পেরেছিলেন। তাকে সমর্থন দেবার জন্য মানুষ খুঁজে পাননি তিনি। এক বন্ধুর পরামর্শে রফিক সাহেব গিয়েছিলেন এক প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে। তার সততা ও নিরপেক্ষতার সুনাম অনেকের মতো রফিক সাহেবও শুনেছেন। ভাগ্য খারাপ রফিকেরই ছিল। সেদিন সেই ব্যক্তির দলের সমর্থনপুষ্ট এক ছাত্রনেতা খুন হয়েছে আততায়ীর গুলিতে। ভীষণ উৎক্ষিপ্ত ও বিচলিত ছিলেন তিনি। রফিক সাহেবের বিচারের আবেদন এক কথায় নাকচ করে ধমকে উঠেছিলেন—এত কথা শুনবার সময় নেই আমার। যান। সময়ের মূল্যে ব্যক্তিটির কাছ থেকে ফিরে এসেছিলেন রফিক। অসংখ্য নিরুপায় মানুষের মতোই মাথা নামিয়ে দিয়েছিলেন অবিচারের কাছে। আর নিজের সংসারটিকে বিশাল সমুদ্রে কলার ভেলা হয়ে ভাসিয়ে নিয়েছিলেন। অভাবের ঢেউয়ের সঙ্গে প্রাণপণ যুদ্ধ করেছেন। কী লাভ হয়েছে তাতে। তিনি তো বিজয়ী হতে পারেননি। একটি সিগারেটের পয়সা বাঁচিয়ে কি একটি ছেলের জীবন বাঁচানো যায়। সত্যি কি এখন একটি সিগারেট খেয়ে ফেলবেন রফিক! সিগারেটের ধোঁয়ায় উড়িয়ে দেবেন হারুণকে খুঁজে আনবার দায়িত্ব!

— কী হয়েছে? এমন করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

মাহমুদা এসে হাত রাখলেন রফিকের বুকে। নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন রফিক সাহেব। নিঃশব্দে বললেন—তুমি তো অন্তত বুঝতে পারছ কী হয়েছে। কেন তাহলে জানতে চাইবার অভিনয়টুকু করছ!

মাহমুদার হাতের ওপর হাত রাখলেন রফিক সাহেব। খুব সহজ, স্বাভাবিকতায় বললেন—একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে। কোথায় পাই বল তো!

অবাক চোখে তাকালেন মাহমুদা। তিনি জানেন, অনেক আগে খুব অবিন্যস্ত বোধ করলে রফিক সাহেব ঘন ঘন সিগারেট ধরাতেন। মাহমুদা রাগ করতেন— পয়সাগুলোকে ধোঁয়া করে উড়িয়ে দিতে যে কি সুখ!

হাসতেন রফিক—জানো, এই ধোঁয়ার কত দাম। কত বড় বড় সমস্যা, কত বিরাট কাজকে ধোঁয়ার মতো হালকা আর সহজ করে দিতে পারে।

স্বামীর হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন মাহমুদা। বিষণ্নতায় মুড়ে ফেললেন নিজেকে। অপরাধীর মতো বললেন—তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

যেন কিছুই হয়নি। এই রাত যেন কোনো আতংকিত সমস্যা আক্রান্ত নয়। এরকম স্বাভাবিকতায় হাসলেন রফিক। আবার পা বাড়ালেন বাইরের দরজার দিকে—যাই, বাইরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথাও দোকান খোলা আছে কি না দেখি।

সিগারেটের ইচ্ছা প্রচণ্ড পিপাসা হয়ে চঞ্চল করে তুলেছে তাঁকে। গলির শেষ মাথায় মোল্লার দোকান। দোকানের পেছনেই তাঁর বাসা। ডাকাডাকি করলে হয়তো উঠে আসবে। সিগারেটও দেবে। কোনো প্রশ্ন করবে না। এ গলিতে বাসা নেবার পর থেকে মোল্লার সঙ্গে চেনা।

আগে সে খাতির করত। এখন সমীহ করে। সেটা হারুণের কারণে। হারুণ এখন এ পাড়ার ভরসা এবং ভয় দুটোই। হারুণের সশস্ত্র প্রতাপের খবর পাড়ার ছোট বাচ্চাটাও জানে। মোল্লার কাছ থেকে একটা সিগারেট নিয়ে তারপর যদি হালকা ধোঁয়ার মতোই প্রশ্ন করেন—শহরের হালচালের খবর জানো না কি কিছু! কোনো গোলমালের ঘটনা....

—সিগারেট লাগবে?

চমকে উঠলেন রফিক। প্রশ্নটা মাহমুদার।

—হারুণের ঘরে সিগারেট আছে, এসো।

চার

রুনুর ঘরের পাশেই হারুণের ঘর। একসময় এটা ছিল এ বাড়ির বসার ঘর। পুরনো এক সেট সোফা, একটা কমদামি শোকেস আর বইয়ের র‍্যাকে সাজানো ঘরটার একপাশে ছিল হারুণের খাট আর পড়ার টেবিল। এখন এটা শুধুই হারুণের ঘর। দামি আলমারি, খাট, টেবিল এনেছে হারুণ। ছেলের রোজগারে দামি আসবাবপত্রের জৌলুসে মা-বাবার তো খুশি হবার কথা। মাহমুদা হননি। ভয় পেয়েছেন। যেন কেউ চোরাই মাল এনে লুকিয়ে রাখছে তার বাড়িতে। তার কাছেই রফিক সাহেব জেনেছিলেন হারুণ মাহমুদাকে টাকা রাখতে দিয়েছিল। সেই মুহূর্তে স্ত্রীকেই সবকিছুর জন্য দায়ী করে ফেলেছিলেন রফিক—সব দোষ তোমার। তোমার লজ্জা করে না। ছেলে ঘরবাড়ি সাজাচ্ছে। ছেলে মায়ের হাতে টাকা তুলে দিচ্ছে—কোথা থেকে এসব পাচ্ছে সে খবর নিয়েছ? লোভ! খুব লোভ হয়েছে ছেলের রোজগার খাবার।

কেঁদে ফেলেছিলেন মাহমুদা—আমি কি করব। ও কি আমার কথা শোনে?

রাগে জ্বলে উঠলেন রফিক—নাঁকি কান্না কাঁদতে এসো না। ওকে বলে দিও, ওর একটা পয়সাও যেন আমার সংসারে না পড়ে। বলে দিও, ওই পাপের টাকাকে আমি ঘেন্না করি। থুথু দিই...

কথাটা হারুণের কানে পৌঁছেছিল। তার চিৎকার, দাপাদাপি শুনতে শুনতে স্তব্ধ পাথর হয়ে বসেছিলেন রফিক।

—পাপের টাকা! কিসের পাপ! নিষ্পাপ হয়ে বসে থাকুক রফিক সাহেব। চাকরির জন্য ছাতা বগলে ঘুরতে থাকুক মানুষের দরজায় দরজায়—তখন বুঝবে টাকার কোনো পাপ নেই।

এরপর হারুণ আর মায়ের কাছে টাকা রাখেনি। মাকে সংসারের জন্য টাকা দিতেও আসেনি। রফিক সাহেব যেন খুঁজলেন হারুণকে। আলনার ওর তোয়ালে। খাটের পাশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোছানো স্যান্ডেল। টানটান পরিপাটি বিছানা। কলঘর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে যেন এখুনি হারুণ এসে শুয়ে পড়বে বিছানায়। একটা মশার কয়েল পর্যন্ত জ্বালিয়ে রেখেছিলেন হারুণের মা। জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে গেছে সেটা। কয়েলের স্ট্যান্ডের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে ঠাণ্ডা ধূসর ছাই।

ড্রেসিং টেবিলের দিকে ফিরলেন রফিক। টেবিলের ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে হারুণের আফটার শেভ লোশন, দামি পারফিউম, চিরুনি, চুলের ব্রাশ। কোথায় রাখে ও সিগারেট। মাহমুদা হয়তো জানে। মাহমুদা চলে গেছেন ওঘরে। টেবিলের ড্রয়ার টানলেন রফিক। সঙ্গে সঙ্গে হিমবাহের শীতলতা জমাট বরফ করে দিল তাঁকে। তিনি কি স্বপ্ন দেখছেন! ভালো করে তাকালেন। নাঃ ভুল দেখেননি। ষাট পাওয়ারের আলোয় ধারালো দ্যুতিতে জ্বলে উঠেছে ড্রয়ার বোঝাই টাকার তোড়া।

মাহমুদ!...

ডাকটা আর্তনাদের মতো হয়ে বের হলো গলা দিয়ে। দম করে অনাবশ্যক জোর দিয়ে ঠেলে দিলেন ড্রয়ার। তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন রফিক।

—কী হলো? কী হলো ওখানে।

ছুটে এলেন মাহমুদা। চৌকাঠে ঠোকর খেয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন দরজার সামনে। ফ্যাকাশে মুখে ভয়ার্ত চোখে তাকালেন রফিকের দিকে।

—তুমি কি জান, হারুণ কোথায় কী রাখে?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীকে বিদ্ধ করলেন রফিক। ক্লান্ত করুণ মহিলাটিকে এর বেশি কিছু বলতে ইচ্ছে হলো না। নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন মাহমুদা। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—সিগারেট পেয়েছ?

সম্ভবত মাহমুদা কিছু অনুমান করেছেন। শঙ্কিত চোখে তাকিয়ে আছেন। মুখ ঘুরিয়ে নিলেন রফিক। ঠাণ্ডা গলায় বললেন—না। খুঁজছিলাম।

আসলে সিগারেট খুঁজবার উৎসাহ আর নেই তাঁর। এখন তাঁর মনে পড়ল হারুণের টেবিলে দামি বিদেশি মদের বোতল যেদিন প্রথম দেখেছিলেন তিনি, সেদিন বাড়িতে ভূমিকম্পের তোলপাড় তুলে দিয়েছিলেন। চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করেছিলেন। ছেলেকে খুন করবেন। টুকরো টুকরো করে গাঙে ভাসিয়ে দেবেন। এমন ছেলের মুখ তিনি জীবনেও দেখবেন না—এমন দৃপ্ত ঘোষণাও দিয়েছিলেন। হাসি পেল তাঁর এখন। কই, কিছুই তো করেননি। করতে পারেননি। হারুণ এরপর কতবার বেসামাল হয়ে বাড়ি ফিরেছে। গলা তুলে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছে—আমার টাকায় আমি খাই। কারো বাবার টাকায় নয়।

—চুপ। চুপ। তোর বাবা শুনবে।

—শুনুক। শুনুক ওই ভাষা আন্দোলনের মহান নেতা। তাকে আমি পরোয়া করি না। কোনো শালা হারামিকে পরোয়া করি না আমি। জানো, আমার নামে শহর কাঁপে।

পাশের ঘর থেকে শুনেছেন রফিক। মনে হয়েছে গোটা পৃথিবীটা প্রচণ্ডভাবে কাঁপছে। হাতের কাছ থেকে সবকিছু গড়িয়ে পড়ছে। ভেঙে চুরমার হচ্ছে। পাগলের মতো পথ হেঁটে বেড়িয়েছেন রফিক। এমন কুৎসিত ধূর্ত ঘটনার প্রতিকার খুঁজেছেন। এরকম খুঁজতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুঁজতেই চলে এসেছিলেন মিনার বাড়ি। মিনাকেই অবলম্বন মনে হয়েছিল। মিনা তো অনেক আপন ছিল তখন। রফিক সাহেবের এখনকার চাকরিটা তো মিনাই দিয়েছে ওদের ফার্মে। রফিকের ছোট ভাই মাহফুজ বেঁচে থাকলে মিনা তো আপনই হতো।

মিনা বাড়িতে ছিল। রফিককে এনে বসার ঘরে বসালো। এয়ারকুলার খুলে ঘর ঠাণ্ডা করল। কোল্ড ড্রিংক্স আর নাশ্‌তার প্লেট নিজে হাতেই নিয়ে এলো। মিনার সুখী পরিতৃপ্ত মুখে তাকিয়ে উৎক্ষিপ্ত স্নায়ু শান্ত হয়ে এলো। রফিক সাহেবের তখন ওকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো, এখনও কি ষোলোই ডিসেম্বরে মিনা সাদা শাড়ি পরে মাহফুজের জন্য কাঁদে!

—কী হয়েছে ভাইজান? নাশ্‌তার প্লেট এগিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করল মিনা।

— মিনা, সাতষট্টি সালের ঢাকা ইউনিভার্সিটির সেই ঘটনা কি তোমার মনে আছে?

অবাক চোখে তাকালো মিনা—কোন্ ঘটনা? কী হয়েছে সাতষট্টিতে?

রফিক সাহেব বুঝলেন, মিনা ভুলে গেছে। মিনা এক বলয় থেকে অন্য বলয়ে চলে এসেছে। খাটো চুলের ফিটফাট মহিলাটিকে মাঝে মাঝে মনে হয় অন্য কেউ। মাহফুজের সহপাঠিনী মিনা পাগল ছিল মাহফুজের জন্য। সে মিনাকেই খুঁজতে এসেছেন রফিক বোকার মতো!

—হারুণকে নিয়ে কোনো ঝামেলা হয়েছে?

মিনাকে দেখলেন রফিক। মিনা আগের চেয়ে মোটা হয়েছে। সুন্দর হয়েছে। সুখে আছে। রফিক সাহেব জানেন, মিনার প্রতাপশালী রাজনীতিবিদ ভাসুরের সুবাদেই ওর স্বামী দেলোয়ারের ব্যবসা দিন দিন ফুলে উঠছে। দুর্জনেরা বলে, ওদের টাকা দেশে রাখবার জায়গা হচ্ছে না বলেই বিদেশে রাখতে হচ্ছে।

—কী করেছে হারুণ? আবার প্রশ্ন করল মিনা।

—নতুন কিছু নয়। সাতষট্টিতে যা করেছিল, এখনও তা-ই করছে।

মিনা অবাক চোখে তাকালো—ভাইজান, আপনার কী হয়েছে?

মিনার কণ্ঠের ব্যাকুলতা সচকিত করল রফিককে। মিনা কি ভেতরে আগের মিনাকেই লুকিয়ে রেখেছে! তা কি করে সম্ভব। মিনার স্বামী দেলোয়ারকে ব্যবসার কাজে সারা দুনিয়া ছুটে বেড়াতে হয়। মিনাই তো তখন ওর শিপিং, গার্মেন্টস, ইনডেনটিংয়ের সবকিছু দেখাশোনা করে। মিনা তো এখন চুলে রং দিতে, অর্কিড কিনতে এমন হুটহাট করে বিদেশে যায় আর আসে, যেন পাঁচ মিনিটে নিউমার্কেট থেকে সওদা করে ফিরছে। মিনা অবশ্য এখনও রফিক সাহেবের প্রতি নরম। অফিসে মিনার সামনে চেয়ারে বসেই কথা বলেন রফিক। মিনা তাঁর সঙ্গে অধীনস্থ কর্মচারীর ব্যবহার করে না। অন্য স্টাফদের সামনেও ভাইজান বলে। না, মিনা বদলায়নি। ঝুনুর বিয়ের খরচের জন্য মিনা সেধেই টাকা ধার দিয়েছে। টাকাটা এখনও শোধ হয়নি। মিনাকে এখন রফিক বলতে চাইলেন—মিনা, অনেক আশা করে হারুণকে তোর হাতে দিয়েছিলাম। তুই দেখছিস না, হারুণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

বললেন না। বললেন অন্য কথা—তুই তাহলে সাতষট্টি সালের কথা ভুলে গেছিস? ভুলে গেছিস যে আজকের হারুণের ভাঙনের শুরু তখনই!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফোন বাজল। মিনা উঠে গিয়ে ফোন ধরল। ব্যবসায়ের কথা আলাপ আলোচনা করল অনেকক্ষণ। তারপর ফিরে এলো—শুনলেন ভাইজান, এবারকার শিপমেন্টটা হলো না।

—দেলোয়ার কোথায়?

—ও তো সিঙ্গাপুরে। ক'দিন থাকে ও ঢাকায়। যত ঝামেলা পোহাতে হয় আমাকে। থামল মিনা।

ও এখন সাতষট্টির অর্থনীতির অনার্সের ছাত্রী নয়। ও এখন নব্বইয়ের পটু ব্যবসায়ী স্বামীর সফল সহকর্মিণী। হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমনভাবে পুরনো কথায় ফিরল মিনা—কিসের যেন শুরুর কথা বলছিলেন আপনি ভাইজান?

—বলছিলাম আইয়ুব খান ছাত্র রাজনীতিতে সে সময়েই প্রথম লাঠিয়াল প্রথা চালু করেছিল। তারাই প্রথম অস্ত্র নিয়ে হেঁটেছিল ক্যাম্পাসে। হাত তুলেছিল একজন শিক্ষকের গায়ে।

ভীষণভাবে চমকে উঠল মিনা। মুখের রেখা বদলে গেল ওর। কিন্তু খুব সচেতনভাবেই সেটা লুকিয়ে ফেলল মিনা। মুখ ঘুরিয়ে নিলো রফিক সাহেবের দৃষ্টি থেকে। মিনার ভঙ্গিই বলে দিল, সাতষট্টির সেই কালো দিনের ঘটনাটি সে এখন মনে করতে পারছে। অস্বস্তি নিয়ে কথা বলল মিনা—সেসব তো পুরনো হয়ে শেষ হয়েছে।

—বোধহয় হয়নি। হলে আজও চোখ মেলে বিনা প্রতিবাদে আত্মধ্বংসের জ্বালা সহ্য করতে হতো না।

নিজেকে মজবুত করে নিল মিনা। সরাসরি তাকাল—এখনও তো কত ব্রিলিয়ান্ট ছেলেমেয়ে রয়েছে দেশে। তারা কেন এগিয়ে আসে না আপনার ওই আত্মধ্বংসের রোগ সারিয়ে দিতে? তারা কেন নেতা হয় না, রাজনীতির ভার তুলে নেয় না!

তিক্ত নিঃস্ব হাসি ফুটল রফিক সাহেবের ঠোঁটে—মিনা, হারুণ তো গিয়েছিল। ওকে প্রথম দিন মিছিলে দেখে আমার বুক গর্বে ফুলে উঠেছিল...

কথা শেষ না করে উঠে দাঁড়ালেন রফিক সাহেব। দাউ দাউ করে জ্বলছে বুক। মিনার ঠাণ্ডা সুখী ঘর সে জ্বালা নেভাতে পারছে না। সারা পৃথিবীর ওপর আক্রোশে সেই জ্বালাকে ছিটিয়ে দিলেন রফিক—মিনা, একটা দেশের ভবিষ্যৎ সে দেশের ইয়ং গ্রুপ। সেটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার অর্থ চোরাবালির ওপর সৌধ গড়ে তোলা। যখন ধস নামবে তলিয়ে যাব আমরা সবাই, কোনো অস্তিত্বই আমাদের থাকবে না।

মিনাও উঠল। তীব্র দৃষ্টিতে দেখল রফিক সাহেবকে। ভঙ্গি পাল্টে গেল তার। গলার স্বর বদলালো। থেমে থেমে অন্য মানুষের মতো অন্য কথা বলল—আমার ছেলেমেয়ে আসবে সামারের ছুটিতে। ওদের টিকিটের জন্য ট্রাভেলিং এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করবার কথা ছিল আপনার, করেছেন?

দপ করে থেমে গেল সব আক্রোশের জ্বালা। রফিক সাহেব মনে করতে পারলেন, তিনি মিনার কর্মচারী। তিনি মিনাকে বলতে চেয়েছিলেন—মিনা তোর ভাসুরকে বল, আমি হারুণকে ফেরত চাই।

বলা হলো না। এখন তার সামনে মাহফুজের মিনা নেই। ব্যবসায়ী মালিক মিসেস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেলোয়ার। চাকরি দিয়ে যে বাঁচিয়েছে অথচ কিনে নিয়েছে প্রতিবাদের ভাষা।

—সিগারেট খুঁজছিলে না? এই যে, এখানে হারুণের সিগারেট।

মাহমুদার আবছা কণ্ঠ রফিককে ফিরিয়ে নিয়ে এলো ঘরে, যে ঘরে হারুণ নেই। আলমারির পাল্লা খুলে দাঁড়িয়ে আছেন হারুণের মা। রাতের নিঃশব্দ শূন্যতায় ঝলক দিয়ে উঠল বিদেশি সিগারেটের কার্টন। আলমারির তাক বোঝাই। পাশের পেটমোটা মদের বোতলে পিছলে পড়ছে আলোর দীনতা।

প্রচণ্ড ধাক্কায় আলমারির পাল্লা লাথি মেরে বন্ধ করলেন রফিক। বিরাট শব্দে কেঁপে উঠল ঘর।

—ফেলে দাও। দূর করে দাও। এসব দূর করে দাও আমার সামনে থেকে। দু'হাতে মুখ ঢেকে হারুণের বিছানাতেই বসে পড়লেন রফিক। ড্রয়ার বোঝাই টাকা, আলমারি ভরা সিগারেট আর মদের বোতল মরা জন্তুর পচা মাংসের দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে যেন! যেন শত নির্যাতনের অস্ত্র হয়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে তাঁর শরীর। এরকম উপায়হীন যন্ত্রণা সয়েছিলেন একাত্তরে পাকিস্তানি আর্মির কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে। তখন সারাক্ষণ বুকের মধ্যে হেসেছে মাহফুজ। সাহস দিয়েছে—ভয় নেই ভাইজান। আমি তো আছি। আমরা তো আছি। আমরা আসছি। অসহায়ের মতো চোখ তুললেন রফিক দেয়ালে ঝুলানো মাহফুজ আর শফিকের ছবিতে। এখন তিনি বড় একা। বড় উপায়হীন। এখন কেউ তো বলে না—ভয় নেই। আমরা আসছি। কেমন করে বলবে, ওরা যে দু'জন স্মৃতির ছবিতে আটকে আছে। বছরে শুধু একবার আসে।

মাহমুদা কেঁদে উঠলেন ফুঁপিয়ে। পাশের ঘরের দরজা খুলে গেল। ঘুমের চোখে এসে দাঁড়াল রুনু।

—কী হয়েছে? কিসের শব্দ হলো?

মা-বাবার ওপর থেকে রুনুর দৃষ্টি উঠে গেল পাল্লা খোলা আলমারিতে। বিষণ্নতা ছুঁয়ে দিল তাকে। শীতল প্রশ্ন করল—হারুণ বুঝি এখনও ফেরেনি?

পাঁচ

মাহমুদা খুব নিচু শব্দে কাঁদছেন। রফিক উঠে দাঁড়ালেন। হেঁটে গেলেন বারান্দার দিকে। সিগারেট খাবার উদ্দীপ্ত ইচ্ছেটা যেমন আচমকা জ্বলে উঠেছিল, তেমনি হঠাৎ করেই একেবারে নিভে গেছে। বুকে জ্বালা নেই। শুধু শূন্যতা। উদ্বেগ আর উপায়হীনতা ক্রমশ দুর্বল করে তুলেছে রফিক সাহেবকে। রুনু এসে দাঁড়াল রফিকের পেছনে। সান্ত্বনা দেবার মতো করে বলল,

—মা ওরকম করছে কেন বুঝতে পারছি না। এত ভেঙে পড়বার কি আছে! হারুণ তো এরকমই করে! তাছাড়া আমি জানতাম, আজ এমন হবে!

বেগে ফিরলেন রফিক মেয়ের দিকে—

—জানতে? কী জানতে, কী হবে?

বাবার উদ্‌ভ্রান্ত চোখে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেল রুনু—না বাবা। তেমন কিছু নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরকম তো হামেশাই হয়। আসলে আমাদের হলের মেয়েরা বলছিল, হারুণদের দলের সব নাকি সাজ সাজ রব করছে—অন্য দলও বসে নেই...

রুনুর মুখ ঝাপসা হয়ে গেল রফিকের সামনে। আশঙ্কা-উদ্বিগ্নের মধ্যরাতটি সরে গেল প্রেক্ষাপটের আড়ালে।

মাহফুজকে খুঁজতে এসেছেন রফিক নতুন আর্টস বিল্ডিংয়ে। ওকে সঙ্গে নিয়ে জরুরি একটা কাজে যাবার কথা। মাহফুজ বলেছে ও ক্যান্টিনে থাকবে। রিক্‌শা থেকে নেমেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন রফিক। আর্টস বিল্ডিংয়ের সামনের গোলচত্বরে যেখানে ছেলেমেয়েরা বসে আড্ডা দেয়, সেখানে আজ অন্য দৃশ্য। প্রথমে কিছুই বুঝে উঠলেন না! দ্রুত পাশ কাটিয়ে যাবার সময় কেউ একজন বলে গেল—ওদিকে যাবেন না। দেখছেন না সাজ সাজ রবে রণসজ্জা।

দৃশ্যটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। হকিস্টিক, লাঠিসোটা, লোহার রড হাতে গোলচত্বর ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রণসজ্জিত দলই বটে!

প্রশ্ন করে ফেললেন—কারা এরা? কে কাকে মারবে?

—আইয়ুব-মোনেম খানের লাঠিয়ালদের দেখেও চিনতে পারছেন না!

রফিকের কাছে বিস্তৃত বিশ্লেষণ দেবার জন্য কেউ আর দাঁড়াল না। ফিরে লাইব্রেরির দিকে পা বাড়ালেন রফিক। লাইব্রেরির সামনে ঘুরে তিন তলায় মাহফুজের ডিপার্টমেন্টেই ওর খোঁজ করা যাবে।

—ভাইজান! আপনি?

লাইব্রেরির সামনে ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে আছে মিনা। রফিককে দেখে প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়াল—কোথায় যাচ্ছেন আপনি? মাহফুজকে খুঁজতে?

—হ্যাঁ। ও তো বলেছিল ক্যান্টিনে থাকবে।

—ক্যান্টিনে ও নেই। বেরিয়ে গেছে একটু আগেই। দ্যাখেন তো কী সব কাণ্ড! ভীষণ ভয় করছে। কেমন করে বাড়ি যাব?

মিনাকে রিক্‌শায় তুলে নিলেন বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্য। রিক্‌শা মোড় নিয়ে ঘুরতেই চোখে পড়ল আরেক আক্রমণকারী দলের মিছিল। এফ. এইচ. হলের দিক থেকে লাঠিসোটা, লোহার রড হাতে নিয়ে মিছিল করে এগিয়ে আসছে।

রিক্‌শা ঘুরিয়ে নিতে হলো। আর্টস কলেজের গেট পার হয়েও মিনার ভয় কমল না। বলল—আর একটু হলেই পড়ে গিয়েছিলাম গণ্ডগোলের মাঝখানে।

—মাহফুজকে দেখেছিলে আজ?

—হ্যাঁ, সকালেই তো! ও বলল, ড. আবু মাহমুদ মামলায় জিতে গেছেন। বিকেলে ড. মাহমুদের সঙ্গে আমার ক্লাস ছিল। ওর ছিল না। বলছিল বাইরে যাবে আপনার সঙ্গে।

অর্থনীতি ডিপার্টমেন্টের হেড ড. আবু মাহমুদের প্রিয় ছাত্র মাহফুজ। হয়তো ওর শিক্ষকের মামলায় জিতে যাবার খুশিতে তার বাড়িতেই চলে গেছে।

—মাহফুজ ড. মাহমুদের সঙ্গে গেছে নাকি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—না ভাইজান! আমি তো এখুনি ক্লাস শেষ করে নিচে নামলাম। আর নেমেই তো এ ব্যাপার।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়ই চারদিক কেমন রহস্যজনকভাবে ফাঁকা মনে হয়েছিল মিনার। মাহফুজের খোঁজে ক্যান্টিনের দিকে যাবে ভেবেছিল। ইতিহাস বিভাগের হেড সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় বলে গেলেন—দাঁড়িয়ে দেখছ কী! তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাও। পেছনের গেট দিয়ে যাও। তখনই আর্টস ফ্যাকাল্টির সামনে আইল্যান্ডে দখলদারদের দেখতে পেল মিনা। পেছনের দিকের পার্কিংয়ে শিক্ষকদের গাড়ির সারি অল্পক্ষণের মধ্যেই হালকা হয়ে গেল। লাইব্রেরির সামনে আসবার সময় ড. মাহমুদের গাড়িটা দেখতে পেয়েছে মিনা। বলল —মাহফুজ মনে হয় স্যারের সঙ্গে নেই।

সন্ধ্যার পর উদ্‌ভ্রান্ত, উত্তেজিত মাহফুজ ফিরল বাসায়। ক্যান্টিনেই ছিল সে। ড. মাহমুদের মামলা বিজয়ের সুসংবাদ যে দুঃসংবাদ হতে চলেছে বোঝেনি।

বলল—ড. মাহমুদ হাসপাতালে। তাঁর কাছেই ছিলাম এতক্ষণ। পরদিন ছড়িয়ে পড়ল খবর। হকিস্টিক, লোহার রড, চেইন নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মারামারি। অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ড. আবু মাহমুদ বিশেষ মহলের মদদপুষ্ট একদল ছাত্রের হাতে প্রহৃত। তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

—মা, বাবা! তোমরা শুয়ে পড়। আমার মনে হয়, হারুণ আজ রাতে ফিরবে না। রুনু ঘুরে দাঁড়াল নিজের ঘরের দিকে।

—কিন্তু ও যে বলে গেল, ও ফিরবে!

খুব আশার আশ্বাসে কথা বলতে চাইলেন মাহমুদা। পারলেন না। কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল। ছুঁয়ে দিল রুনুকে। হয়তো ভয়কেই ঝাপটা দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাইল রুনু—আঃ মা। কী যে হয়েছে তোমার। ও কখনও ঠিক কথা বলে! ও যে আগের মতো নেই সেটা ভালো করেই জান। আর ও বাড়ি না ফিরলেই বা কি! কেন কাঁদো ওর জন্য শুধু শুধু?

মেয়ের মেজাজ ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করলেন রফিক—তুই ঘরে যা রুনু। শুয়ে পড়।

তারপর খুব আস্তে বললেন—মায়ের কাছে সন্তানের চরিত্রের ভালোমন্দের বিচারটা কাজ করে না রে!

দুমদাম পা ফেলে রুনু চলে গেল নিজের ঘরে। অনাবশ্যক জোরালো শব্দে বন্ধ করল দরজা। মাহমুদা খুব অসহায়ভাবে সেদিকে তাকালেন একবার। তার পরই মুখ নিচু করে ফেললেন।

—ওর মেজাজটা খারাপ। পরীক্ষাটা মাঝপথে থেমে গেল, তাই। মেয়ের হয়ে জবাবদিহি করলেন রফিক। মাহমুদা নিরুত্তর। কাঁদছেন না তিনি এখন আর। রুনুটা লেখাপড়ায় খুব ভালো। হঠাৎ করেই হারুণের তুলনা এসে গেল রফিকের মনে। হারুণও এসএসসিতে স্টার মার্ক পেয়েছিল। খারাপ করল এইচএসসিতে। দ্বিতীয় বিভাগে সাদাসিধেভাবে পাস করল। আর তার জন্য হারুণকেই দোষারোপ করেছেন তিনি। দু'সপ্তাহ ছেলের সঙ্গে কথা বলেন নি। রফিক সাহেবের শীতল ব্যবহারে সেই প্রথম বাবার বিরুদ্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখ খুলল হারুণ— বাবা যদি মনে করে এই রেজাল্ট আমার, মনে করুক। কিন্তু আমি করি না। এ রেজাল্ট আমার নয়। আমারটা চুরি হয়েছে।

ছেলেকে ধমক দেবার সাহস তখনও রফিকের ছিল—বাজে কথা বলতে এসো না। রেজাল্ট কখনও চুরি হতে পারে?

—কেন হবে না। টাকা দিলে সবই হয়। যে দেশে আস্ত মানুষ চুরি হয়ে যেতে পারে, সে দেশে...

—হারুণ থাম।

—ধমক দিও না বাবা। নিজেকে জিজ্ঞেস কর—তোমার চাকরিটা কীভাবে চুরি হয়েছিল...

টুক্ করে সুইচের শব্দ হলো। রুনুর ঘরে আলো জ্বলছিল। এখন নিভে গেল। রফিক সাহেব বুঝতে পারলেন ও ঘুমোতে পারছে না। ওর নির্বিকার অবজ্ঞার মধ্যে হয়তো কাঁদছে নিরুপায় বিদ্রোহ। রফিক সাহেবের এখন মনে পড়ল, হারুণের লেখা প্রথম কবিতাটি রুনুই লুকিয়ে এনে দেখিয়েছিল বাবাকে। আশ্চর্য! হারুণ একসময় কবিতা লিখত। ফুল, পাখি, গাছ, নদী আর মানুষকে ভালোবাসত। মাহমুদা চলে গেছেন বারান্দায়। তার ছোট্ট হালকা শরীর বাঁকা হয়ে ঝুঁকে আছে রেলিংয়ে। দৃশ্যটা বেদনার মতো। বুকে আলোড়ন উঠল। ছেলের জন্য ভীষণ ব্যাকুল হলেন রফিক হঠাৎ। অস্থির পায়চারি করলেন ঘরে। নিজেকেই প্রশ্ন করলেন—কেমন করে লুট হয়ে গেল হারুণের সব ভালোবাসা! কারা লুট করল?

মাহমুদা মুখ ফেরালেন। কান্নার মতো আবছা অস্ফুট একটু শব্দ করলেন শুধু। কথা বললেন না।

ছয়

কুয়াশা ভেজা প্রতীক্ষার মধ্যরাতটি কেঁপে কেঁপে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল। রফিক সাহেব দেখলেন, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের তিন তলার কেবিনে। বেডে শুয়ে আছেন আহত, অসুস্থ ড. আবু মাহমুদ। চারপাশে ঘিরে আছে তাঁর কিছু ছাত্রছাত্রী। মাহফুজই নিয়ে এসেছে রফিককে। ছাত্রছাত্রীদের মাঝ থেকে কেউ একজন প্রশ্ন করল—কেন এসেছিল ওরা আপনাকে মারতে? কী বলছিল?

ড. মাহমুদের মুখে হাসি—তাদের প্রথম কথা ছিল, আর মামলা করবি?

কথা বলতে বলতে হাত তুললেন ড. মাহমুদ—এই হাত যদি কাউকে মারে, হাতের কি কোনো দোষ হবে?

কথাটা অনেকেই বুঝতে পারেনি। রফিকও বোঝেননি। বুঝেছিলেন পরমুহূর্তেই। ড. মাহমুদের সারা শরীরে, হাতে রক্ত জমাট ফুলে ওঠা নীল দাগ কলংকের চিহ্ন হয়ে ফুটে আছে। সেই হাত তুলে ধরলেন ড. মাহমুদ—যারা আমাকে মেরেছে, তারা তো এই হাত। হাতের কোনো দোষ নেই। দোষ তো তার, হাতটাকে যে চালায়।

ছবিটা ফিরে গেল। রফিক সাহেব হেঁটে এলেন বারান্দায়। গলিতে চোখ রেখে একইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন মাহমুদা। রফিকের পায়ের শব্দে ফিরলেন। যেন কিছুই হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুই ঘটেনি এরকম স্বাভাবিকতায় জোরালো হতে চেষ্টা করলেন মাহমুদা—

—তোমাকে চা করে দেব এক কাপ?

রফিক সাহেব মাঝে মাঝে ভোর রাতে উঠে এক পেয়ালা গরম চা খেতে পছন্দ করেন। তারপর আকাশে তারা থাকতেই বেরিয়ে যান হাঁটতে। এখন মাথা নেড়ে অনিচ্ছা জানালেন—নাঃ। থাক।

তাঁর ভাঙাচোরা মুখে গলির ল্যাম্পপোস্টের আলো বিশীর্ণ আভা ফেলেছে। খুব ক্লান্ত-অবসন্ন বোধ করলেন। উদ্বেগ আর ভয়ের অনুভূতিটা সংক্রামক। নইলে এমন অনিয়ম তো আগেও ঘটেছে। হারুণ বাড়ি ফেরেনি। এতখানি বিচলিত কি হয়েছেন তিনি! হয়তো আজ রাতের এই আতংকিত প্রতীক্ষার আবহ সৃষ্টির দায় মাহমুদারই। সংক্রমণটা তিনিই ছড়িয়েছেন। স্বামীর মনোভাব আঁচ করতে পেরেছেন যেন মাহমুদা। মাথাটা নিচু করে ফেলেছেন অপরাধীর মতো। হারুণের হয়ে মাথায় নিচ্ছেন সব লজ্জা, ভয় আর অপমানের বোঝা। মাহমুদার পাশে দাঁড়ালেন রফিক। একটা হাত রাখলেন তার হাতের ওপর। ঠাণ্ডা হাতটা কেঁপে উঠল।

আকাশে হালকা মেঘ জমেছে। একটা তারাও খুঁজে পাওয়া যায় না। সেদিকে তাকিয়ে অল্প হাসলেন রফিক—হারুণের দায় তুমি একাই বয়ে চলেছ। ওর জন্মের সময় থেকেই। মাহমুদা কথা বললেন না। একা একা বলে চললেন রফিক—ওর যখন জন্ম হলো, তখন আমি ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি।

এতক্ষণে ঠোঁট নড়ে উঠল মাহমুদার—যেদিন হারুণ এলো, সেদিনই এলো শফিকের খবর। খবর নিয়ে এলো মাহফুজ।

রফিক আর মাহমুদা একই সঙ্গে কোনো দুঃস্বপ্নের সীমানায় পা রাখলেন। ঊনসত্তরের আন্দোলনে পথে নেমেছিল মাহফুজ। একাত্তরে সে আগুন হয়ে জ্বলে উঠল। একাত্তরের পঁচিশে মার্চে সন্ধ্যার দিকে একবার বাড়ি এসে উত্তেজিত খবর দিয়ে গেল—আজ ওরা শহরে আর্মি নামাচ্ছে।

অনিশ্চিত দিনরাত্রির ভারে থমথমে ঢাকা শহরের পথে পা বাড়ালো মাহফুজ। পেছন থেকে ডাকলেন রফিক—কখন ফিরবি? ভীষণ অবাক হয়ে বড় ভাইকে দেখল মাহফুজ। তারপর জানিয়ে গেল—যেদিকে চলেছি আমরা, সেখান থেকে ফেরা যায় না আর।

যেমন উত্তেজিত হয়ে বাড়ি ফিরেছিল মাহফুজ, তেমন উত্তেজিত হয়েই বেরিয়ে গেল। এখনও ওর সেই চলে যাবার ভঙ্গিটি মনে করতে পারেন রফিক। নির্ভয়, উদ্দীপনায় জ্বলজ্বল করছিল মাহফুজ। নিজের ওপর রাগ হয়েছিল রফিকের। সাত কোটি মানুষের অস্তিত্বের দাবিতে ছাত্র রাজনীতির সীমিত বেড়া ভেঙে বেরিয়ে এসেছে মাহফুজ। ঘরের নিরাপদ আশ্রয়ে কেমন করে সে ফিরতে পারে। তিনি নিজেও কি পেরেছিলেন! মহম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার রেসকোর্সের ময়দানে দাম্ভিক ঘোষণা দিয়েছিলেন—'এদেশের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।' সে ঘোষণার প্রতিবাদে যাঁরা চিৎকার করে হাত তুলেছিল, তাঁদের মাঝে রফিকও ছিলেন। ইস্‌কুলের ছাত্র তখন তিনি। বৃষ্টিতে ভিজে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে ঢাকার রাস্তায় হেঁটেছিলেন। আর বায়ান্ন সালে ইস্ট পাকিস্তানের চিফ সেক্রেটারি যখন বাংলা ভাষার দাবির ওপর গুলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চালাবার হুকুম দিয়েছিল, তখন তিনি কলেজের ছাত্র। ক্লাস ফেলে বেরিয়ে এসেছিলেন পথে। একশ' চুয়াল্লিশ ধারা লাথি মেরে ছুড়ে ফেলে প্রতিবাদ করেছিলেন। জেলে গিয়েছিলেন।

মাহফুজ বেরিয়ে গিয়েছিল। মাহফুজের বড় শফিক, আর্মির ক্যাপ্টেন। শফিকের পোস্টিং তখন জয়দেবপুরে। কার্ফুবন্দি ঘরে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমাগত রেডিওর নব ঘুরিয়ে গেছেন রফিক। ছাব্বিশে মার্চের সকালে তাঁর রেডিওতে ধরা পড়ে গেল। গাজীপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে পাঠান জয়দেবপুরের সংকেত। উর্দু আর ইংরেজিতে। 'সেনড অ্যামুনেশন। সেনড অ্যামুনেশন।'

বুঝে ফেলেছিলেন রফিক, যুদ্ধ শুরু হয়েছে। দু'দিন পরেই পেয়ে গেলেন শফিকের খবর, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আনুগত্য বুটের তলায় পিষে দিয়ে অস্ত্রসহ অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়ে বেরিয়ে গেছে সে। এক সপ্তাহের মধ্যেই এক কনভয় পাকিস্তানি আর্মি ঘিরে ফেলল রফিক সাহেবের বাসা। জিপে উঠিয়ে নিয়ে গেল তাঁকে ক্যান্টনমেন্টে। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। অস্ত্রের মুখে নির্যাতিত হয়েছেন যখন তিনি, তখন মায়ের কোলে এক হারুণ। রফিকের বাসায় সেদিনই পৌঁছেছিল খবর, বেলুনিয়া সীমান্তে শহীদ হয়েছে শফিক। মাহফুজ তখন গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং শেষ করেছে। সেও আর আসেনি। শহীদ হয়েছিল তেলিয়াপাড়ায়।

আমরা তিনটি ভাই দেশের জন্য, মানুষের জন্য নিজের সুখকে, জীবনকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। আর হারুণ! সে কি আমাদের এ বাড়ির ছেলে নয়?

দু'হাতে কপালের রগ টিপে ধরলেন রফিক সাহেব।

কুয়াশার আড়ালে মেঘ ঘন হয়ে বাতাসে ঠাণ্ডা ঝাপটা তুলেছে। আচমকা বিদ্যুৎ চমকালো। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা খাওয়া গলির ম্লান আলোয় চোখ রেখে কথা বললেন রফিক—তুমি জান, এমনি কত রাত শফিক আর মাহফুজের অপেক্ষায় পথ চেয়ে থেকেছি। মনে হয়েছে, একদিন হয়তো দু'জন আসবে। বলবে, আমরা বেঁচে আছি।

—কিন্তু ওরাও তো ফেরেনি।

মাহমুদাকে প্রচণ্ড ধমকে থামিয়ে দিলেন রফিক—কে বলে ওরা ফেরে না? ওরা সবাই ফেরে। ফেরে না শুধু হারুণ।

নিচু শব্দে দুঃখী মানুষের মতো করুণ বিলাপে আবার কেঁদে উঠলেন মাহমুদা—আমার হারুণ, আমার এই আঁচল আঁকড়ে সে ঘুমিয়েছে। আমার এই হাতে মাখানো ভাত খেয়ে সে বড় হয়েছে। কেন সে ফিরে আসবে না আমার বুকে?

রফিক বুঝি আবেগহীন বিচারকের আসনে উঠে বসেছেন। আর সেখান থেকেই যেন বললেন—একাত্তরের যুদ্ধের গোলাগুলির শব্দ শুনতে শুনতে যে পৃথিবীতে এসেছিল, অস্ত্রকে সে চিনেছিল জন্মমুহূর্তে। কিন্তু কেন সে অস্ত্র, সে জ্ঞান তখন তার হয়নি। হয়তো আজো হয়নি।

সাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাতের বাতাস হঠাৎ থমকে গেল। গুম গুম শব্দে তোপধ্বনি করল দূরের আকাশ। রণসজ্জিত মেঘ। কুয়াশা কেঁপে উঠল। রফিক সাহেব বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। জায়নামাজ থেকে উঠে এলেন মাহমুদা। আলতো হাত রাখলেন রফিকের পিঠে। প্রান্তরের বাতাসের মতো মিহি বিলাপে করুণ শোনালো তাঁর কণ্ঠ—কেউ ওকে খুঁজবে না? কেউ যাবে না ওকে খুঁজতে?

রফিক সাহেব নিরুত্তর।

মাহমুদার বিলাপ করুণ কণ্ঠ দাবির কণ্ঠ হয়ে উঠল—আমার হারুণকে ফিরিয়ে এনে যাও!

ফিরে দাঁড়ালেন রফিক—লাঠিয়ালকে ফিরিয়ে দেবার দায়িত্ব আমার নয়।

রফিকের কথা চাবুক হয়ে আঘাত করল মাহমুদাকে—কী বললেতুমি তো আরেকদিনও এই কথাই বলেছিলে।

মাহমুদার ভঙ্গি আনত হলো। অন্ধকারে তাকিয়ে অর্থহীন উচ্চারণে বিড় বিড় করলেন —লাঠিয়াল। লাঠিয়াল। আমার হারুণ লাঠিয়াল হয়ে গেছে।

এখন তার সেই দিনের হারুণের চেহারাটি মনে হলো। কোথা থেকে তাড়া খেয়ে পালিয়ে ফিরছিল হারুণ। বাড়ি ফিরল দশদিন পরে। কপালের বাঁ দিক ফুলে আছে। নীলচে কালসিটে ডান গালে। চোখের নিচে কালি। ছেলের হতচ্ছাড়া উদ্‌ভ্রান্ত চেহারায় তাকিয়ে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল মাহমুদার। প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছিলেন তিনি—একি চেহারা। কোথা থেকে কী ঘটিয়ে এলি! কোথায় অ্যাকসিডেন্ট হলো!

দুম করে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে চোখ বন্ধ করল হারুণ। ছেলের গায়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে চোখে পানি এসে গেল—কী হয়েছে হারুণ? কেমন করে ব্যথা পেলি বাবা?

ঝাড়া দিয়ে মায়ের হাত সরিয়ে দিল হারুণ—উঃ যাও তো। এসব প্যানপ্যানানি ভালো লাগে না।

ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন মাহমুদা—

—দেখি কাউকে পাই কি-না, তোর বাবাও বাসায় নেই যে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে।

এক ঝটকায় উঠে বসল হারুণ—ডাক্তার ফাক্তার কিচ্ছু লাগবে না। কিছু হয়নি আমার। খামোখা জ্বালিও না তো!

পকেট থেকে রিভলবার বের করে নির্বিকার ভঙ্গিতে মায়ের হাতে দিল হারুণ। খুব অনায়াসে বলল—এটা রেখে দাও। আর বেশি চেঁচামেচি কোর না। পুলিশ এলে তখন তো ভয়ে মরবে।

—পুলিশ! পলকের জন্য চমকে উঠলেন মাহমুদা। তারপর রিভলবার নামিয়ে রাখলেন হারুণের পাশে। কণ্ঠস্বর বদলে গেল তার। ধমকের মতো করে বললেন—কেন, পুলিশ কেন আসবে? নিশ্চয়ই কিছু খারাপ কাজ করেছিস!

ক্ষ্যাপা জন্তুর মতো চিৎকার করে উঠল হারুণ—হ্যাঁ, করেছি। খারাপ কাজ করেছি। করব। আরো করব, কী করবে তুমি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুক্ষণের জন্য বোবা হয়ে গেলেন মাহমুদা। এ কি হারুণ! তার এই শান্ত, ভদ্র ছেলে হারুণ! তার সামনে তো এক রুক্ষ বেপরোয়া যুবক, যার চেহারার প্রতিটি ভাঁজে ফুটে উঠেছে দুষ্কৃতকারীর কদর্য কঠিনতা। তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেও মাহমুদার কষ্ট হচ্ছে।

সে রাতেই পুলিশ এলো। সারা পাড়ার লোকের সামনে দিয়ে পুলিশের গাড়িতে উঠে চলে গেল হারুণ। তখনই কেঁদে উঠল মায়ের শূন্য অন্তর।

সব অভিমান আর অভিযোগ পানি হয়ে গেল। সেই মুহূর্তে হারুণকে ফিরিয়ে আনা ছাড়া আর কোনো চিন্তাই মাহমুদার ছিল না। যেন ছেলের জন্য ভিক্ষুকের মতো মানুষের কাছে হাত পাততেও তার দ্বিধা নেই।

কাঁদতে কাঁদতে স্বামীর দুই হাঁটু জড়িয়ে ধরলেন মাহমুদা—আমার হারুণকে ফিরিয়ে এনে দাও। ফিরিয়ে এনে দাও। হারুণ আমার একটা মাত্র ছেলে!

পাথর হয়ে বসে আছেন রফিক। শুধু বললেন—কেমন করে?

—যেমন করে হোক। যে করেই হোক। আমার ছেলেকে আমার কাছে এনে দাও।

—পারব না।

স্বামীকে তখন হৃদয়হীন নিষ্ঠুর মনে হলো। আবার অনুনয়ের কান্নায় ভেঙে পড়লেন মাহমুদা—একবার মিনার কাছে যাও।

—পারব না।

চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালেন মাহমুদা—কেন পারবে না? হারুণ কি তোমার ছেলে নয়? ওর জন্য কি তোমার কোনো দায়িত্ব নেই!

ভীষণ জোরে ধমক দিয়ে উঠেছিলেন রফিক—ছেলের অপকর্মের দায়িত্ব আমার নয়। ওর কাজের সাজা ওকেই পেতে দাও।

অন্ধকারে তাকিয়ে খুব আস্তে নিঃশ্বাস ফেললেন মাহমুদা। হারুণকে সাজা পেতে হয়নি। ক'দিন পরেই ছাড়া পেয়ে উদ্ধত পায়ে গলি দিয়ে হেঁটে এসেছিল হারুণ। দুঃখে, বিস্ময়ে আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলেন মাহমুদা—কেমন করে ছাড়া পেয়ে এলি?

—ছাড়াবার মানুষ কি আমার নেই ভেবেছ! তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী তারা। আমি যদি একশ'টা খুনও করি, কিছু হবে না আমার।

প্রচণ্ড আঘাত মায়ের জন্য ছুড়ে দিয়ে হারুণ নিষ্ঠুর হাসি হাসতে শুরু করেছিল। কিন্তু সে তো আগের কথা। কিন্তু আজ! আজ যে হারুণ বলছিল, সে ফিরবে!

গলিতে মানুষের পায়ের শব্দ। কেউ একজন হেঁটে আসছে। রফিক সাহেব, মাহমুদা দু'জনেই ঝুঁকে পড়লেন রেলিংয়ে। নোংরা কালচে আলোয় স্পষ্ট হলো একটি মানুষের অবয়ব। বাঁকা চোরাভঙ্গিতে হেঁটে আসছে কেউ। স্পঞ্জের চপ্পলের খসখসে টানা শব্দটা একজন ক্লান্ত মানুষের। হারুণ এমন শব্দে হাঁটে না। পায়ের শব্দ থামল না রফিক সাহেবের বাড়ির সামনে। চলে গেল বাড়ি ছাড়িয়ে। হারুণ নয়, অন্য কেউ। মাহমুদা মুখ ফিরিয়ে নিলেন। চলে এলেন ঘরের দিকে। অজু করে জায়নামাজ পাতলেন। তাহাজ্জদ পড়া হয়ে গেছে। নফল নামাজ শুরু করলেন। রফিক সাহেব ঘরে এলেন। সুইচ টিপে আলো নেভালেন। বসে পড়লেন বিছানায়। খুব আস্তে অনেকটা স্বগত সংলাপের মতো উচ্চারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেন—লাঠিয়ালের দুঃখে কে কবে কাঁদে।

কথাটার জবাব এলো না। জায়নামাজে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন মাহমুদা। কান্নার আবেগে তার ছোট্ট গোল হয়ে যাওয়া শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে।

রফিক সাহেব আবার বললেন—লাঠিয়ালের মা!

সঙ্গে সঙ্গে আরো উচ্ছ্বসিত হলো মাহমুদার কান্না।

গুম গুম শব্দে মেঘ ডাকল। বিদ্যুতের নীলাভ আলোয় পলকের জন্য ধাঁধিয়ে গেল আকাশ। মধ্যরাতের নগরী হঠাৎ আলোর ঝলকে নিমেষের জন্য দেখা দিয়ে আবার ডুবে গেল অন্ধকারে। নিজের নিষ্ঠুর কথায় নিজের ওপরই ক্ষিপ্ত হলেন রফিক সাহেব। এ কী করছেন তিনি! উপায়হীন, অসহায়, দুঃখী মহিলাটি যে হারুণের মা তা কি তিনি ভুলে যাচ্ছেন বারবার! পৃথিবীর সবাইকে ছেড়ে ওকেই রফিক আঘাত করছেন আক্রোশে। বেচারী! পৃথিবীর সব মায়ের মতো সেও সন্তানের অপরাধ নিজের অপরাধ বলেই বিনাপ্রতিবাদে মাথায় তুলে নিচ্ছে। এই মুহূর্তে মাহমুদার জন্য নরম সমবেদনার ঢেউ উঠল তার বুকে। উঠে এলেন মাহমুদার পাশে। তার মাথায় হাত রাখলেন।

—মাহমুদা। ওঠো। কেঁদো না। হারুণের জন্য অনর্থক চিন্তা করে কষ্ট পাচ্ছ। আজ না ফিরুক। হয়তো কাল কিংবা পরশু সে ফিরবে। না ফিরে যাবে কোথায়।

উঠলেন মাহমুদা। স্বামীর হাতটা আঁকড়ে ধরলেন প্রচণ্ড ভরসায়—তোমার মনে হচ্ছে ও ফিরে আসবে?

—আসবে।

—কিন্তু আজ যে ও একেবারেই অন্যরকম ছিল। এমন ওকে অনেকদিন দেখিনি। অনেকদিন কেন? কোনোদিনই দেখিনি। তাই তো এত ভয় হচ্ছে আমার।

মাহমুদার ভয়টাকে তাড়িয়ে দিয়ে সহজ করতে চাইলেন রফিক। স্ত্রীকে তিনি চেনেন। অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষ। স্বামী সন্তান ছাড়া তার জীবনে আর কিছুই নেই। এখন হঠাৎ করেই রফিকের খুব মজার একটা কথা মনে পড়ল। মিনার অফিসে খুব গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত এক মহিলা এসেছিলেন ক'দিন আগে। মাস্টার্স ডিগ্রি আছে তার দু'টো সাবজেক্টে। পিএইচডিও করেছেন। মিনার বান্ধবী। তার ছেলে বিদেশে থাকে। আর ছেলের জন্য ভীষণ দুশ্চিন্তায় ভোগেন তিনি। মিনার স্বামী দেলোয়ার বলছিল—আপনারা লেখাপড়া জানা মা হয়ে সেকেলে মায়েদের মতো এমন উতলা হয়ে যান কেন?

মহিলা হাসলেন। বললেন—আমার বাড়ির বুয়ার ছেলে রিক্‌শা চালায়। কোথাও রিক্‌শা দুর্ঘটনার খবর শুনলেই সে কাঁদতে বসে। তখন আমার মনে হয়, আমার সঙ্গে ওর কোনো তফাৎ নেই। কুইন এলিজাবেথ যখন মা, তখন তার সঙ্গে আমাদের ঢাকার বস্তির পচার মায়ের কোনো প্রভেদ নেই। পৃথিবীর তাবৎ মা সন্তানের জন্যই একইভাবে চিন্তিত হয়।

মহিলার কথা খুব মজার মনে হয়েছিল। এখন মাহমুদাকে তিনি সেভাবেই দেখলেন। খুব আস্তে বললেন—মাহমুদা, ওঠো। আমাকে এক কাপ চা করে দাও। মাথাটা বড় ব্যথা করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহমুদা উঠলেন। জায়নামাজ ভাঁজ করে রাখলেন। নিঃশব্দে চলে গেলেন রান্নাঘরে। ভালোই হলো। হয়তো কিছুক্ষণের জন্য হারুণের মায়ের চিন্তা হারুণকে ছেড়ে স্বামীর দিকে ফিরবে! কথাটা ভেবে হাসি পেল রফিকের। নিজেকে নির্বোধ মনে হয়। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কে পেরেছে মায়ের বুক থেকে সন্তানের চিন্তার ব্যবচ্ছেদ করতে।

আট

একটি অসহায় দুঃখী মায়ের মুখ খুঁজে পেলেন রফিক সাহেব মনের ভেতর। মুখটা কার? মনে পড়ে গেল, মুখটা লাঠিয়ালের মায়ের। খুব ছেলেবেলায় দেখা। তাকে দেখেছিলেন রফিক মায়ের সঙ্গে নানার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে। পদ্মাপাড়ে মানিকগঞ্জের বিখ্যাত মেহেরুল্লাপুর পরগনার ডাকসাইটে প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন রফিকের মায়ের পুর্বপুরুষেরা। সেসব দাপট রফিক দেখেননি। শুনেছেন গল্প। মায়ের কাছে, নানীর কাছে। পদ্মার ভাঙনে বিলীন হয়েছে শান-শওকত, অপচয়, অত্যাচার আর বিলাস-ব্যসনের সাক্ষী আদি খান বাড়ি। নতুন বাড়ি করে গেছেন নানা। নানাকে রফিক দেখেননি। নতুন বাড়ির বাংলাঘরের ফরাস, বাঁয়া তবলা, সারেঙ্গী, কাঠের দেয়ালে ঝুলানো হরিণের শিঙ, বাঘের চামড়া আর সোনারুপার কাজ করা বাটালিযুক্ত ভোজালি তাঁর ক্ষমতা আর আভিজাত্যের সাক্ষী হয়েছিল। সেটাই দেখেছেন রফিক। নানীর ঘরের এক কোণের কাঠের সিঁড়ি বেয়ে মামাতো ভাইদের সঙ্গে একদিন কারে উঠেছিল রফিক। আবিষ্কার করে ফেলেছিল এক অস্ত্রাগার। মরচেধরা রামদা, সড়কি, বল্লম, ছ্যান সারা কারে ছড়ানো। খুব ভয় পেয়েছিল রফিক। মামাতো ভাই হিরু আর বাবুকে জিজ্ঞেস করল—এসব কী? কী হয় এগুলো দিয়ে?

হিরু নির্বিকারে উত্তর দিল—আমরা এগুলো দিয়ে চর দখলের ফৌজদারি খেলা খেলি। খেলবি তুই?

রফিকের ভালো লাগল না দৈত্যের হাত-পায়ের মতো অদ্ভুত মরচে ধরা কতগুলো অস্ত্র নিয়ে অজানা খেলা খেলতে।

—চর দখলের ফৌজদারি আবার কি খেলা?

রফিকের প্রশ্নে হিরু বাবু হেসে সারা। তার দাদাভাই আর দাদাভাইর বাবার লাঠিয়ালরা এইসব অস্ত্র নিয়ে প্রতিপক্ষের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো— সে গল্প তারা জানে। রফিককেও শোনালো। সন্ধ্যার পর নানীর কোলের কাছে বসে প্রশ্ন করল রফিক—নানী, চর দখলের ফৌজদারিতে কি মানুষ মারা যেত?

নানীর পায়ে তেল মালিশ করছে তার বাঁদী আমিরজান। রফিকের কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ল—ওমা! কুটি মিয়ার এইডা কেমুন কথা। চর দখলে যদি মানুষই না খুন হইল, তো ফৌজদারি কিসের!

ধমক দিয়ে বাঁদীকে থামালেন নানী। শহুরে নাতিকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

—আরে ভাই, সেইসব দিন কি আর মেহেরুল্লাপুর পরগনার খান বাড়ির আছে! অহন তো সব সরকারের। আগে তো পুরা তল্লাটই আছিল মেহেরুল্লাপুর পরগনার জমিদার খানেগো। তখন কত চর দখল, কত ফসাদ, কত ফৌজদারি দেখছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেসব গৌরবের কাহিনী খুলে বসল নানী। একবার পদ্মায় জেগে ওঠা নতুন চর নিয়ে কার্তিকপুরের জমিদারদের সঙ্গে বিরাট ফৌজদারি হয়েছিল। দু'পক্ষের এত লোক মারা গিয়েছিল যে, পদ্মার ঘোলা পানি লাল হয়ে গিয়েছিল মানুষের রক্তে।

—নানা কি রামদা হাতে নিয়ে মানুষ মেরেছিল?

রফিকের প্রশ্নে সবাই হেসে উঠল। নানীও হাসল—দুর পাগল! মিয়া সাহেবরা কি নিজেরা কখনো লাঠালাঠি করে। তারা অইল খানদানি মানুষ, জমিদার। এইসব তো তারা করাইতো লাঠিয়াল দিয়া।

—লাঠিয়াল কি নানী?

—লাঠিয়াল হইল গিয়া পোষা চাকর। মারামারি, কাইজা-ফসাদ, খুনখারাবির লিগা তাগো রাখা হইত। অনেকে আবার জমিজিরাত, ঘর-বাড়িও পাইত। আসলে লাঠিয়ালরা ছিল রায়ত।

নানীর সব কথা রফিক বুঝল না। শুধু বুঝল, লাঠিয়ালরা ডাকাতজাতীয় খারাপ লোক।

নানী আরেক গল্প ফেঁদে বসলেন। একবার কলাকোপার রাজাদের সঙ্গে মেহেরুল্লাপুরের খানদের বিরাট বিবাদ বেধে গেল। এক বাঈজীকে নিয়ে রেষারেষি চলছিল আগে থেকেই। সে সময় রফিকের নানার চাচাতো ভাই গিয়েছিল শিকারে। পদ্মার চরে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরছিল। কলাকোপার জমিদারের লাঠিয়ালরা তাকে আটক করল।

—আটক করে কী করল তারা? রামদা দিয়ে মারল?

রফিকের প্রশ্নে পুরনো দিনের আভিজাত্যে ঝলক দিয়ে উঠলেন নানীপাগল। জমিদাররা কি ছোটজাত যে ছোটকাম করব। এক জমিদার আরেক জমিদারের গায়ে হাত তোলে না। বেশি করলে মামলা করে, জেল খাটায়।

—তাহলে আটক করল কেন?

—করল অপমান করনের লিগা। কলাকোপার জমিদারের হুকুমে তার ঘোড়া আটকে দিল। পায়ের জুতা খুইল্যা নিয়া লাঠিয়ালরা তারে চরের মধ্যে ছাইড়া দিল। জমিদারের ব্যাটা। তারে খালি পায়ে চরের বালির ওপর দিয়া হাইটা আসতে হইল, এইটা কি কম অপমানের কথা! তবে সেও কসম খাইয়া বইল যে, এর শোধ নিব।

গল্প করতে করতে নানী নিজেই যেন সেসব দিনে ফিরে গেলেন। পদ্মার নতুন চরে তখন বসত বসিয়েছে কলাকোপার জমিদাররা। সেই চরে হামলা করল খানেদের লাঠিয়ালের দল। চরের এক রায়তের বউর পেট এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল খানের লাঠিয়ালের সড়কিতে। সে ছিল আবার পোয়াতি। তাতে কি! এক রাতে সড়কির আক্রমণে আর আগুন লাগিয়ে দু'পক্ষেরই লোক মরল প্রচুর। খানেদের দু'জন লাঠিয়াল ধরা পড়ল কলাকোপা দলের হাতে। রামদার কোপে তাদের হাত-পা কেটে খণ্ড খণ্ড করল। তারপর চরের মাঝখানে বাঁশের আগায় ঝুলিয়ে রাখল তাদের লাশ। পচে গলে কংকাল হয়ে ঝুলে রইল দুই হতভাগা লাঠিয়ালের মৃতদেহ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নানীর আঁচল আঁকড়ে ধরল রফিক—নানী, আমার ভয় করে।

—ভয় কি রে! জমিদাররা এসব না করলে আবার দাপট কিসের?

এসব নিয়ে তারপর হলো মামলা মোকদ্দমা, কোর্ট কাচারি। আর ক'দিন পরেই হয়ে গেল মিটমাট। মামলা তুলে নিল জমিদাররা। খান বাড়িতে দাওয়াতে এলো ঢাকার ইংরেজ কালেক্টর সাহেব। পদ্মায় বজরা ভাসল। নহবত বাজল। দু'রাত ধরে চলল খানাপিনা। খেমটা নাচ। ফুর্তি।

এই ফুর্তিতে দাওয়াতে এলো কলাকোপার জমিদারও। মিলমিশ হয়ে গেল। — আর সেই লাঠিয়াল?

—তারা তো কংকাল হইয়া ঝুলতে থাকল চরে।

নানীর বাঁদী আমিরজান রফিককে বলেছিল—চল কুটি মিয়া, লাঠিয়ালের মা দেখাইয়া আনি তোমারে।

আমিরজান নিয়ে গিয়েছিল রফিককে।

নানা বাড়ির পেছনে বাগিচার শেষ মাথায় লাঠিয়ালের মায়ের কুঁড়েঘর।

আমিরজান গল্প করল—বুড়ির জান বিলাইর হাড্ডি। অহনও চিল্লাইয়া কান্দনের লিগা বাইচ্যা রইছে।

লাঠিয়ালের মাকে দেখে রফিকের কান্না পেয়েছিল। ঘোলা চোখে তাকিয়ে বিড়বিড় করেছিল— কী দেখবার আইছ। আমার পোলায় তো ফিরে নাই।

তারপর মাটিতে মাথা ঠুকে গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদেছিল। দৃশ্যটা কিছুতেই বহুদিন পর্যন্ত ভুলতে পারে নি রফিক।

আমিরজান অবশ্য বলেছিল—বুড়িও কম না।

ওর পুরনো গল্পটা রফিকের নানার বাড়ির সবাই জানে। ইংরেজ সাহেবকে নিয়ে যখন পদ্মায় প্রমোদতরী ভেসেছে, বাজি পুড়ছে, নহবতের বাজনা নদীর বুকে কড়া ঝংকার তুলেছে, বুড়ি নাকি তখন একাই ডিঙি বেয়ে চরে গিয়ে উঠেছিল ছেলের লাশ আনতে। পারেনি। ধরা পড়েছিল পাইকদের হাতে। তাকে আনা হয়েছিল রফিকের নানার সামনে। লাঠিয়ালের মা জমিদারের পায়ের ওপর পড়ে গিয়েছিল।

— আপনেগো বিবাদ মিটা গ্যাছে। অহন আমার পোলার লাশ আমারে ফিরাইয়া দেন।

এমন একটা অদ্ভুত দাবি অনেককেই হাসিয়েছিল সেদিন। লাঠিয়ালরা মিয়া নয়। সাহেব নয়। তাদের লাশ চরের মাটির সাথে মিশে যায়। পদ্মার স্রোতে ভেসে যায়। এটাই তো নিয়ম। লাঠিয়ালের মা ছেলের লাশ পায়নি। পেয়েছিল মাসোহারা আর মাথাগোঁজার কুঁড়েঘর। লাঠিয়ালের মায়ের কান্না মধ্যরাতে শিহরণ তুলে আঘাত করে তখনও খান বাড়ির দেয়ালে। কারো কারো ঘুম ভাঙে। কিন্তু তারা আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে। কান্নাটা তেমন দামি কারো নয়। লাঠিয়ালের মায়ের।

নয়

খুট করে সুইচ টেপার শব্দ হলো। আলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন মাহমুদা। মধবিত্তের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষয়িষ্ণু শ্রীহীন সংসার প্রকট হয়ে উঠল আলোয়। মাহমুদার মুখটা ভালো করে দেখলেন রফিক। নিঃশব্দ কান্না থমকে আছে দু'চোখে। মাহমুদাকে কি লাঠিয়ালের মায়ের মতো করুণ দেখাচ্ছে!

—তোমার চা!

ধোঁয়া ওড়া চায়ের পেয়ালা রাখলেন মাহমুদা খাটের পাশে। টেবিলে।

পাশের জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন রফিক—বস এখানে।

প্রাণহীন যান্ত্রিকতায় বসে পড়লেন মাহমুদা। তাকে একটি বালিকার মতো দেখাচ্ছে। তিনটি ছেলে-মেয়ের মা এতগুলো বছর ধরে এ সংসারে একাত্ম হয়ে আছেন, সেটা এখন যে ভাবা যায় না। অভিমানী কিশোরীর মতো মাথা নিচু করে আছেন। বুকে মমতার ঝিরঝিরে হাওয়া উঠল। খুব আলগা করে স্ত্রীর মাথায় হাত রাখলেন রফিক—এত কেন উতলা হচ্ছ! নতুন করে তো কিছু হয়নি।

কথাটা বলেই থমকে গেলেন রফিক। তিনি নিজেও আজ অজানা কারণে বড় বেশি বিভ্রান্ত হারুণের জন্য। মাহমুদাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে তিনি আসলে নিজেকেই সান্ত্বনা দিচ্ছেন। সাহস আর শক্তি সঞ্চয় করছেন।

ঘরের এক কোণে পুরনো র‍্যাকে বইয়ের সারি ছুঁয়ে এলো তাঁর দৃষ্টি। ওগুলো হারুণের বই। মাহমুদা চোখ তুললেন—হারুণের মনটা খুব নরম ছিল। একবার একটা কুকুরের বাচ্চার জন্য কেমন কেঁদেছিল মনে আছে তোমার?

— হু। দু'দিন ভালো করে খায়নি।

ঘটনাটা দু'জনের একই সঙ্গে মনে পড়ল। রাস্তা থেকে নোংরা একটা কুকুরের বাচ্চা কুড়িয়ে এনেছিল হারুণ। কারা যেন একটা পা খোঁড়া করে দিয়েছে। কি প্রচণ্ড যত্নে বাচ্চাটাকে সেবা করেছিল হারুণ। বারবারই মা-বাবার কাছে প্রশ্ন করেছে—এতটুকু ছোট্ট কুকুরকে এমন করে কেন পা ভেঙে দিয়েছে মানুষেরা? ওরও তো কষ্ট হয়। ও–ও তো ব্যথা পায়!

মা-বাবার শাসন অগ্রাহ্য করে কুকুরের বাচ্চাকে নিজের বিছানায় নিয়ে ঘুমিয়েছে হারুণ। হারুণের বয়স ছিল তখন দশ। বাচ্চাটা বাঁচেনি। দু'দিন পর্যন্ত কাঁদল হারুণ রোগা জখমী পথের কুকুরের শোকে। দোকান থেকে এক বোঝা গল্পের বই কিনে এনে দিয়ে হারুণকে ভাত খাইয়েছিলেন রফিক।

মাহমুদা ধীরে ধীরে বললেন—ছেলেবেলায় হারুণ বই বড় ভালোবাসত। বই নিয়েই ছিল ওর খেলা।

— ও খুব ভালো কবিতা লিখত।

রফিকের দিকে তাকিয়ে সরু হাসি ফুটিয়ে তুললেন মাহমুদা—মনটাও খুব নরম ছিল। একবার নিজের গায়ের সোয়েটার খুলে দিয়ে দিয়েছিল পথের এক বুড়ো ভিখিরীকে।

উজ্জ্বল হলো রফিকের দৃষ্টি—লেখাপড়ায়ও হারুণের মাথা ছিল ভীষণ ভালো। আমি নিজে ওকে পড়িয়েছি তো।

ঘরের গুমোট উৎকণ্ঠা সরে গেছে। বেশ হালকা বোধ করলেন দু'জনেই। গরম চা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরীরের একটানা উদ্বিগ্নতার অবসাদ দূর করে দিচ্ছে। মাহমুদার ভঙ্গি সহজ হয়ে এলো। খুব সুখের কোনো স্মৃতি তাকে প্রফুল্ল করে তুলেছে যেন। হাসলেন—আমাদের সবার জন্য ওর খুব মায়া ছিল। স্কলারশিপের টাকা দিয়ে ও আমার জন্য শাড়ি, তোমার জন্য পাঞ্জাবি কিনে এনেছিল।

—রুনুর জন্য জুতো, ঝুনুর জন্য ব্যাগও তো এনেছিল। আর ঝুনুর মেয়ের জন্য খেলনা।

চায়ের পেয়ালায় আয়েসের ঠোঁট ছোঁয়ালেন রফিক। আশ্চর্য! সবই তো মনে আছে। ঝুনুর বিয়ের সময় মিনার কাছে টাকা ধার চাওয়া একেবারেই পছন্দ করেনি হারুণ। বলেছিল—মানুষের কাছে ধারের জন্য হাত পাতলে সম্মান বিক্রি হয়। আর সাহায্য নিলে স্বাধীনতা বিক্রি হয়ে যায়।

—ও খুব স্বাধীনচেতা, আত্মসম্মানী ছেলে ছিল।

মাহমুদার ভঙ্গিতে ফিরে এসেছে আত্মবিশ্বাসের গর্ব। স্বামীর কথায় পুরনো দিনের মতো ঠোঁটের কোণে গর্বিত হাসি ফুটিয়ে তুললেন। বললেন—ছেলেটা কার দেখতে হবে তো! ছেলে তো বাবার মতোই হবে।

প্রিয় সন্তানের গৌরব নিয়ে দু'জন আশঙ্কিত উদ্বিগ্ন রাতটাকে সম্পূর্ণ ভুলে গেলেন। অবাঞ্ছিত অগৌরবের দিনরাত্রি যেন কখনই হারুণকে বিচ্ছিন্ন করেনি। মাহমুদা বলে উঠলেন —তোমার মনে আছে, সেই যে একবার ফুলছড়ি ঘাটে হারিয়ে গিয়েছিল হারুণ।

চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রাখলেন রফিক। খুব হালকা লাগছে শরীর, মন। একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে হলো আবার। খুব ভালো মেজাজে এলে আয়েস করে সিগারেট ধরাবার অভ্যাসটা ছিল আগে। সিগারেটের ইচ্ছা হঠাৎ ঝলকানিতে মনে পড়িয়ে দিল হারুণের দামি সিগারেটের দৃশ্য। প্রশান্ত মেজাজে টুপ করে পাথর গড়িয়ে পড়ল। অশান্তির ঢেউ উঠল কয়েকটা। ভীষণভাবে স্মৃতির হারুণকেই খুঁজলেন রফিক।

—ভুলে গেছ ফুলছড়ি ঘাটের সেই কাণ্ড?

মাহমুদার প্রশ্নে মাথা নাড়লেন রফিক। ছেলে-মেয়েদের কোন্ ঘটনা কবে কোন্ মা-বাবা ভুলে যায়। রফিক সাহেবও ভোলেননি। ঈদের ছুটিতে সবাইকে নিয়ে দিনাজপুরে মাহমুদার মায়ের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। ফেরী থেকে নেমেই হারুণ নিখোঁজ। মাহমুদা কান্নাকাটি করে হুলস্থূল বাঁধালেন। পাগলের মতো ছুটে ছুটে সব জায়গায় হারুণকে খুঁজলেন রফিক। সবাইকে ধরে ধরে প্রশ্ন করলেন—আপনারা কেউ কি আট বছরের একটা ছেলেকে দেখেছেন? পরনে নীল হাফ প্যান্ট আর সাদা শার্ট। ফর্সা রঙ। ভুরুর পাশে একটা কাটা দাগ। নাম হারুণ।

হারুণকে পাওয়া গেল প্লাটফরম থেকে একটু দূরে। ভিড়ের জটলায় মিশে ম্যাজিক দেখছে। হারুণকে টেনে বের করে এনে কষে চড় বসালেন রফিক—অসভ্য ছেলে। কি করছিলে এখানে?

বাবার চড় খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে হারুণ জানাল—কিছু তো করিনি। শুধু দাঁড়িয়ে ম্যাজিক দেখছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারুণের নাম ধরে এত ডাকাডাকির পরও কেন বেরিয়ে আসেনি সে রহস্য উদঘাটিত হলো। ম্যাজিশিয়ান হুকুম জারি করেছিল, যারা ম্যাজিক দেখছে তাদের সবাইকে পাঁচ মিনিট চোখ বন্ধ করে নিঃশব্দ হয়ে থাকতে হবে। সময় শেষ হবার আগে কেউ যদি চোখ খোলে কিংবা মুখ দিয়ে একটা শব্দ করে— তাহলে সে বাঁচবে না।

রফিক সাহেব ক্ষেপে মারতে গিয়েছিলেন ফেরেপবাজ যাদুকরকে। মারমুখো জনতার তাড়া খেয়ে ম্যাজিকওয়ালা ততক্ষণে তার ঝোলা ফেলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিয়েছে।

রফিক সাহেবের দৃষ্টি দেয়ালে ঝুলানো ফটোগ্রাফে আটকে গেল। ছবিটা পুরনো। সাত আট বছর আগের তোলা পারিবারিক গ্রুপ ফটো। ওই তো হাফপ্যান্ট, হাফশার্ট পরা হারুণ! তাকিয়ে আছে এদিকে। কাচের ভেতর বন্দি হারুণ বুঝি এখুনি ছেলেবেলার মতো করে বলে উঠবে—কি করব বাবা। চোখ-মুখ খুললে আমি যদি প্রাণে না বাঁচি!

দৃষ্টি নামিয়ে নিলেন রফিক। দৃষ্টি মিলল মাহমুদার সঙ্গে। নিঃশব্দ প্রহরে দুঃজনেরই মনে হলো হারুণ হারিয়ে যায়নি। হারুণ তাদের সব পুরনো স্মৃতির খুশি নিয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে এ ঘরে। যেন এখুনি বলে উঠবে—একি! মা, বাবা! কি হয়েছে তোমাদের! এত রাত জেগে বসে আছ?

—ক'টা হলো রাত?

অকারণেই প্রশ্ন করলেন রফিক সাহেব। ঘড়িটা সামনেই। আর ঘরে ষাট পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে। তবু জবাব ঠিকই এলো মাহমুদার কাছ থেকে। তিনি ঘড়িতে তাকিয়েছেন— রাত তিনটে।

গুম গুম শব্দ মেঘের অস্তিত্ব ঘোষণা করল দূরের আকাশ। আরেকবার ঝলক দিল বিদ্যুৎ।

দশ

বাইরে হঠাৎ হুটোপুটির শব্দ উঠল। বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়ালেন রফিক। মাহমুদা ছুটে গেলেন বারান্দায়। অর্ধেক শরীর ঝুঁকিয়ে নিলেন রেলিংয়ে। নিশ্চয়ই হারুণ। হয়তো তার পেছনে তাড়া করে আসছে কেউ। রফিক সাহেব এলেন বারান্দায়—কে? কি?

জবাব দিলেন না মাহমুদা। রুনুর ঘরের দরজা খুলে গেল। এতক্ষণ সেও বোধ হয় ঘুমোয়নি। আলো জ্বালাবার সময় না নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে মা-বাবার পাশে। প্রশ্ন করতে গিয়ে কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল তার—কি হলো মা? কিসের শব্দ হলো?

তিনজন একই সঙ্গে তাকালো গলিতে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। গলির ল্যাম্পপোস্টের আলো যেন ছেঁড়া মশারিতে ঢাকা পড়েছে। স্পষ্ট করে কিছু দেখা যায় না। গলির আনাচে-কানাচে ছুঁয়ে অনেকক্ষণ ঘুরল তিনজনের অনুসন্ধানী ব্যাকুল দৃষ্টি। না, পলায়নপর কাউকে তাড়িয়ে আনছে না আক্রমণকারীর হিংস্র পায়ের শব্দ। ঝিরঝিরে হালকা বৃষ্টিতে নিরুপায় শরীর বিছিয়ে ভিজছে ভাঙাচোরা শ্রীহীন গলি।

রুনু প্রথম কথা বলল—কেউ তো নেই মা! বাবা তুমি কি কাউকে দেখেছ?

রুনুর প্রশ্নটা অভিমানী কান্নার মতো শোনাল। মাহমুদা নিশ্চল। তার আশার দৃষ্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন গলির শেষ মাথায় স্থির।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন রফিক সাহেব—না, কাউকে দেখিনি।

শব্দটা আবার উঠল। চমকে উঠলেন রফিক সাহেব। রুনুও। বৃষ্টির ঝালরে ঘেরা অস্পষ্ট আলোর তলায় শব্দের উৎস আবিষ্কার করে ফেললেন মাহমুদা। আরো কয়েকটি কুকুরের আবির্ভাব ঘটেছে। উচ্ছিষ্টের অধিকার নিয়ে যুদ্ধরত ক্ষুধার্ত কুকুরেরা আক্রমণ পাল্টা আক্রমণের কর্কশ শব্দে ভরিয়ে তুলেছে গলি। উচ্ছিষ্ট কুড়ানো মানুষটি ভিজতে ভিজতে বাঁকানো শরীর সোজা করতে চেষ্টা করছে বারবার। দুর্বল হাত তুলে তাড়া দিচ্ছে—যাঃ যাঃ।

একটু পরে সেও ঝিমিয়ে গেল। অজ্ঞাত সমঝোতায় সন্ধি হয়ে গেল কুকুর আর মানুষে। দৃশ্যটা কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরনো হয়ে মানিয়ে গেল ভেজা রাতের শরীরে। রুনু মুখ ফিরিয়ে নিল। অসহিষ্ণু গলায় কথা বলল রুনু—

—এসব ভালো লাগছে না। এসব সহ্য করতে পারছি না। উঃ অসহ্য। অসহ্য।

মাহমুদা ঘুরে দাঁড়ালেন—কী হলো, এমন করছিস কেন? কি সহ্য হয় না?

ক্ষেপে উঠল রুনু—জান না, কী সহ্য হয় না। জিজ্ঞেস করছ কেন?

রফিক সাহেব থামিয়ে দিলেন রুনুকে—আঃ রুনু থাম তো।

ক্ষিপ্ত ভঙ্গি নরম হয়ে গেল রুনুর। বয়সী মানুষের উদ্বেগ নিয়ে বলল— আমার মনে হচ্ছে, আজ কিছু একটা হবে।

—কী হবে? কী বলতে চাচ্ছিস তুই। আক্রমণের তীক্ষ্ণধার ঝলসে উঠল মাহমুদার দু'চোখে। আপাতত রুনুই প্রতিপক্ষ।

—আমি জানি না। বলতে পারব না।

—যা জানিস না, তা বলে ভয় দেখাতে আসিস কেন?

মাকে ঠাণ্ডা জবাব ছুঁড়ে দিল রুনু—নতুন করে ভয় পাবার কী আছে। আর কিসেরই বা ভয়। ভয় না পেয়ে রাগ আনতে পার না মনে?

রুনুর কণ্ঠে, রুনুর ভঙ্গিতে অচেনা কোনো তরুণীর বিদ্রোহ থমকে আছে। সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে অভিযোগে ও যেন দুর্বিনীত হয়ে উঠেছে। আঘাত করার প্রচণ্ড ইচ্ছায় যথার্থ স্থান খুঁজে ফিরছে। অবরুদ্ধ আক্রোশ ধাক্কা মারল রুনুর কথায়—

—লাথি মেরে ভেঙে ফেলতে পারো না সব ভয়ের দেয়াল! পার তো কেবল বড় বড় কথা বলে প্যানপ্যানিয়ে কাঁদতে।

রুনু হাঁফাচ্ছে। রফিক সাহেব দু'হাতে রুনুকে ধরলেন।

—কী পাগলামি শুরু করলি?

বাবার হাতের ওপর দুর্বল হয়ে ভেঙে পড়ল রুনু—বাবা, আমার কষ্ট হচ্ছে বাবা।

—আয়, ঘরে আয়।

রুনুর হাত ধরে নিয়ে এলেন রফিক। বসিয়ে দিলেন বিছানায়। ঘরের আলো নিভিয়ে দিলেন মাহমুদা। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন দরজায়। স্তব্ধ হয়ে থাকল রুনু অনেকক্ষণ। তারপর স্বাভাবিক হলো। সহজ গলায় বলল—বাবাও বিদেশে যেতে চেয়েছিল যদি দিতে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি ওকে এই গলির মধ্যে আটকে না রাখতে, তাহলে হয়তো ও আজ এমন হতো না।

রফিক সাহেবের হঠাৎ মনে হলো, আজকের রাতটা একটা অস্বাভাবিক রাত। আর সেই কারণেই তারা সবাই বারবার স্বাভাবিক হতে ভুলে যাচ্ছেন। এমনকি রুনুও।

কথা বলে উঠলেন মাহমুদা। তার কথায় ঝলক দিয়ে উঠল ক্ষোভ— ছেলেমেয়েকে বিদেশে লেখাপড়া করবার মতো পয়সা যে আমাদের নেই, সেটা কি কেউ জানে না। যার যেমন কপাল!

সূক্ষ্ম আলপিনের মতো খোঁচাটা এসে বিঁধল রফিক সাহেবকে। মাহমুদা কখনও তাকে দোষারোপ করেন না। কিন্তু আজ কি তাই করেছেন। স্বামীর অক্ষমতাকেই দায়ী করছেন ছেলেমেয়েদের ব্যর্থতার জন্য। বেখাপ্পাভাবে রেগে উঠলেন তিনি হঠাৎ—

—দেশ ছেড়ে সরে যাওয়া তো পালিয়ে যাওয়া। সমস্যা থেকে পালিয়ে যাওয়াটা জীবন নয়।

বাবার কথার উত্তাপ আমলে আনল না রুনু—তুমি তোমার অক্ষমতা চাপা দেবার জন্য যা খুশি তা-ই বলতে পার। তবে আমি বলব এটা পালানো নয়, জীবন খুঁজে বের করা।

—রুনু!

—হ্যাঁ বাবা। তা-ই যদি না হবে, তাহলে হারুণকে নিয়ে কেন এত ভয়, লজ্জা, উদ্বেগ আমাদের?

—সেটা আমাদের ভাগ্য।

—ওটা ঠিক কথা নয়। বরং ওটা তোমাদের অক্ষমতা। ওই অক্ষমতার জন্যেই হারুণ জীবন পেল না। ও তো হতে পারত কবি, লেখক, বড় ব্যবসায়ী, চাকুরে, ডাক্তার কিংবা বড় একজন নেতা। বল, পারত কি না?

রফিক সাহেব উঠলেন। হেঁটে চলে গেলেন বারান্দার দিকে। যেতে যেতে বললেন— রুনু, আমরা দোষ চাপাবার আসল জায়গা খুঁজে পাচ্ছি না বলেই হয়তো নিজেদের মধ্যে পরস্পরকে দোষারোপ করে হালকা হতে চাচ্ছি। এসব কথা তুলে লাভ নেই।

এতক্ষণে ক্লান্ত, বিষণ্ন অনুনয়ে ব্যাকুল হলেন মাহমুদা—তোমরা কেউ কি একবার হারুণের খোঁজ করবে না? গিয়ে দেখবে না, কোথায় কি হলো আমার ছেলেটার!

রফিক সাহেব কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, বলা হলো না। বুকের ভেতর চাপ ধরা ফিকে ব্যথায় দম বন্ধ হয়ে এলো তাঁর। বসে পড়লেন তিনি। মাহমুদা ছুটে এলেন। অন্ধকার হাতড়ে হাত রাখলেন রফিকের পিঠে—কী হলো! কী হলো তোমার? কথা বলছ না কেন!

রুনু এসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল রফিককে—বাবা! কী হয়েছে বাবা!

টেনে নিঃশ্বাস নিলেন রফিক সাহেব। আস্তে বললেন—ও কিছু না। হঠাৎ বুকটার মধ্যে যেন কেমন করে উঠল।

রুনু আর মাহমুদা রফিক সাহেবকে ঘরে নিয়ে এলেন। শুইয়ে দিলেন বিছানায়। রুনু রফিকের মাথায়, বুকে ব্যস্ত উদ্বিগ্ন হাত রাখল—বাবা! কেমন লাগছে বাবা! গরম চা করে দেই এক কাপ? হাত তুলে নিষেধ জানালেন রফিক।

—না মা। তুই আমার কাছে থাক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুনু খুব বিভ্রান্ত বোধ করছে—বাবা, ভোর হলেই আমি ডাক্তারের কাছে যাব।

রফিকের মাথার কাছে নিষ্প্রাণ কাঠের মতো দাঁড়িয়ে আছেন মাহমুদা। যেন কথা বলতে ভুলে গেছেন।

—মাহমুদা! আস্তে ডাকলেন রফিক।

একটু থেমে বললেন—ভয় পেও না মাহমুদা, আমার তেমন কিছু হয়নি।

রফিক সাহেব স্বাভাবিক নিঃশ্বাস নিলেন। এরকম ব্যথা আগেও তাঁর দু'একবার হয়েছে। ডাক্তার বলেছে, হার্টের কিছু নয়। খুব বেশি টেনশনে এরকম হয়। বুকে হাত রাখল রুনু—বাবা! তুমি আমার ওপর রাগ করেছ?

অনুতপ্ত রুনুর চোখের পানি ঝরে পড়ল রফিক সাহেবের কপালে। হাত বাড়িয়ে রুনুকে বুকের কাছে টেনে আনলেন রফিক। আদরের হাত বুলিয়ে দিলেন ওর মাথায়।

—কাঁদিস না মা!

মুহূর্তে বিরাট এক দুঃখের নদী যেন প্রচণ্ড আবেগে, শব্দে, আলোড়নে ভেঙে পড়ল। প্রবল কান্নায় বুঝি চৌচির হয়ে গেল রুনু—কেন ফিরে এলো না হারুণ! কোথায় গেল! তোমরা আমার আদরের ছোট ভাইটাকে ফিরিয়ে এনে দাও। কেন তোমরা কিছু করছ না এখনও?

ঝড়ে দোলা লাগা গাছের মতো দুলে উঠলেন মাহমুদা! খাটের স্ট্যান্ড ধরে পতন থেকে নিজের শরীর বাঁচালেন। ভাঙা গলায় কোনো রকমে উচ্চারণ করলেন—কাঁদিস না রুনু। হয়তো সে ফিরে আসবে।

রফিক সাহেব উঠে বসলেন। মেয়েকে সান্ত্বনা দেবার মতো কোনো আশার নরম কথা খুঁজলেন। পেলেন না। বাবার কোলে মুখ রেখে কাঁদছে রুনু। কান্নার মধ্যেই অসহায় জবানবন্দি দিয়ে যাচ্ছে—বাবা, তোমাদের আমি দোষী করতে চাইনি। কিন্তু সারাক্ষণ আমাকে অস্থির করে তোলে রাগ, ভয়, দুঃখ। সে কথা আমি কাউকে বলতে পারি না বাবা। কাউকে না।

—রুনু। রুনু ওঠ। কাঁদিস না। কান্নাটা তো হেরে যাওয়া। আমি চাই তুই অন্তত হেরে যাস না। জিতে যাবার জন্য কেউ থাকুক।

ধীরে ধীরে মাথা তুলল রুনু। উঠে বসল! কান্নার দমকে কেঁপে ওঠা শরীর স্থির হলো। ভেজা ভেজা বিষণ্ন শব্দে একাই কথা বলল—ছেলেবেলায় একবার ও আমার ইস্‌কুলের বই ছিঁড়ে ফেলেছিল। ওকে আমি এত জোরে চড় মেরেছিলাম যে, ওর ফরসা গালে লাল হয়ে ফুটে উঠেছিল আমার পাঁচ আঙুলের ছাপ। ও আমার দিকে এমন করে তাকিয়েছিল, সে চোখে আমি ভীষণ অভিমান আর দুঃখ দেখেছিলাম। যেন বলছিল—তোরা আমাকে এত ব্যথা দিতে পারিস! বারান্দায় কোণে বসে অনেকক্ষণ কেঁদেছিল হারুণ। ও বড় ভালো ছেলে ছিল বাবা।

কথা শেষ করে আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রুনু—আমার একমাত্র ছোট ভাইটা। ছেলেবেলায় আমরা একসঙ্গে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে ইস্‌কুলে গেছি। ও কখনো কারো সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করেনি—সে কোথায় চলে গেল? মা, বাবা! তোমরা কি বলবে না কিছু?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রফিক সাহেব কথা বললেন না। মাহমুদা নিস্তব্ধ। গুম গুম শব্দে মেঘ ডাকল। বৃষ্টির ঝাপটা ভিজিয়ে দিতে থাকল খোলা বারান্দা।

এগারো

মাহফুজ দাঁড়িয়ে আছে সামনে। মাহফুজ বলছে—ভাইজান! খবর শুনেছ, টোকা খুন হয়েছে!

ব্যস্ত হয়ে অফিসে বেরুচ্ছিলেন রফিক। আইয়ুব খানের উন্নতির দশক 'ডিকে'র প্রচার চলছে। অফিসে প্রচণ্ড চাপ। সারাক্ষণই সাজ সাজ। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান সদম্ভে প্রচার করেছেন—দেশ যখন অরাজকতা আর বিশৃঙ্খলায় তলিয়ে যাচ্ছিল, তখন দেশপ্রেমী সৈনিকরা চুপ করে থাকতে পারেনি। তারাই দীর্ঘ দশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশকে উন্নতির দশকে পৌঁছে দিয়েছে।

সারাদেশে উন্নতির চরম বিজয় ঘোষণা করে ঝলমল করছে আলোকসজ্জিত ভবন। গড়ে ওঠা তারবেলা, মংলা। মাথা তুলেছে দ্বিতীয় রাজধানী ইসলামাবাদ। পঁয়ষট্টি সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কিছুটা ঘাটতি পড়লেও উন্নতি থেমে থাকেনি।

মাহফুজের কাছেই শুনেছেন রফিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মারপিটের ঘটনার অভিযোগ নিয়ে কিছু শিক্ষক দেখা করেছিলেন প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সঙ্গে। তিনি তখন ঢাকায় এসেছিলেন। মহা খাপ্পা হয়ে উঠলেন—পেয়েছ কি তোমরা! হাম সারে দুনিয়া সে ভিখ মাঙকে লাতা হ্যায় তোম লোগ কো খিলানে কো লিয়ে, আওর তোম সব আপস মে ফসাদ কি মজাক উড়াতে হো! সোচা মুঝে কুছ পাতা নেহি হ্যায়!

উন্নতির দশকে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব নিজেই ভিক্ষাবৃত্তির স্বীকারোক্তি তুলে ব্যাপারটা ধামাচাপ দিয়ে দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসের চারা শক্তিশালী বৃক্ষের অবয়বে মাথা উঁচু করতে শুরু করল।

মাহফুজ আবার বলল—টোকার যে এমন হবে এটা কে ভেবেছিল!

কথাটা সত্যি। আইয়ুবী সমর্থনপুষ্ট বিভীষিকা সৃষ্টিকারী টোকা ছিল শক্তিশালী লাঠিয়াল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আতংক সৃষ্টি করে সে রাজার মতো হেঁটে বেড়াত। কোনো এক সময় সে ছাত্র হয়েই এসেছিল সে কথা সবাই ভুলে গিয়ে বলত, মোনেম-আইয়ুবের ভাড়াটে গুণ্ডা।

হাতে ঘড়ি পরতে পরতে প্রশ্ন করলেন রফিক—কী করে খুন হলো?

—কী যেন। শুনছিলাম ভাগবাটোয়ারা নিয়ে ওদের নিজেদের মধ্যেই গোলমাল চলছে। দলের কেউ করতে পারে। লাশ পাওয়া গেছে রমনা পার্কে।

টোকার অপমৃত্যুর খবর বাতাসের বেগে ছড়িয়ে গেল ঢাকা শহরে। দলে দলে লোক ভিড় করল রমনা পার্কে। যেন দুর্ধর্ষ ডাকাত অথবা ত্রাস সৃষ্টিকারী বাঘ মারা পড়েছে পুলিশ কিংবা শিকারির গুলিতে। রফিকও গেলেন। রমনা পার্কের বৃষ্টিভেজা ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে টোকার লাশ। বিশাল দেহের সুদর্শন যুবকটির খোলা গায়ে আর ট্রাউজার্সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাদা রক্তে মাখামাখি। অবহেলায় পড়ে থাকা এই দীন—মৃতের দিকে তাকিয়ে দু'চোখে পানি এসে গেল রফিকের। চারপাশের কৌতূহলী মানুষের ভিড়ে শোক নেই। বিচ্ছেদের বেদনা নেই। স্বজন হারানোর বেদনায় কোথায় কোন্ অন্ধকার ঘরে লুকিয়ে কাঁদছে ওর মা বোন—সেটা জানবার সমবেদনা কারো নেই।

ফিরলেন রফিক মেঘেঢাকা উন্নয়নের দশকের ঝলমলে নগরে। যে নগরীটির সকাল নিরুপায়ভাবে নির্বিকার একটি সম্ভাবনা হারানো তরুণের অপমৃত্যুর প্রতি।

ফেরার সময় দেখা হলো মাহফুজ আর মিনার সঙ্গে। পাবলিক লাইব্রেরির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে ওরা। রফিককে দেখে এগিয়ে এলো। উত্তেজনার রেশ ওদের চোখে। হয়তো টোকাকে নিয়েই আলাপ চলছিল। মিনা বলল—দেখে এলেন?

—হু। খুব সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন রফিক। মনটা ভালো লাগছে না। টোকার করুণ মৃত্যুতে টোকার জন্যই শোকার্ত হচ্ছেন রফিক। অথচ এর আগে সবার মতো রফিকও ওকে ঘৃণাই করেছেন।

—বাঁচা গেছে। এবার ঢাকা ইউনিভার্সিটি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। আপনি দেখে নেবেন, নিজেরা খুনোখুনি করেই ওরা সব ক'টা মরবে।

মিনার উত্তেজিত খুশির সংলাপ ব্যথিত করল রফিককে। কিছু বললেন না তিনি।

—অত খুশি হয়ে নাচতে শুরু কোর না। মাহফুজের টিপ্পনীতে আরো জোরদার হলো মিনা।

—আমি একা কেন। অনেকেই খুশি হয়ে নাচতে শুরু করেছে।

—অপেক্ষা কর। আরো অপেক্ষা কর। আইয়ুব-মোনেম শাহী যে বীজ ছড়িয়ে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে, একে নির্মূল করতে সময় লাগবে। এক টোকা গেছে, আরো কত টোকা সেই বীজ থেকে গজিয়ে উঠবে কে জানে!

অন্ধকার ঘরটি বৃষ্টির মৃদু শব্দ নিয়ে স্পষ্ট হলো। সেই অন্ধকারে তাকিয়ে এখন খুব আশ্চর্য বোধ করলেন রফিক। এত বড় সত্যি কথাটা সেদিন মাহফুজ কেমন করে বলেছিল! টোকার মৃত্যু আলোচনার ঝড় তুলেছিল। কিন্তু আরো কয়েকটি অপমৃত্যু টোকার অপমৃত্যুকে ভুলিয়ে দিল। ঊনসত্তরে লাহোরে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে পুলিশ লাঠিচার্জ করল। সিন্ধে, করাচিতে ছাত্র-জনতা পথে নামল। তার ঢেউ এসে লাগল ঢাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলঙ্কের ছাপ মুছে ফেলল। গৌরবের সংগ্রামী আন্দোলন ফিরে পেয়ে গেল প্রতিবাদী শক্তি। পথে নামল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সত্যিকার গণতন্ত্র চাই। চাই আইয়ুব শাহীর পতন। আগরতলা ষড়যন্ত্রের বানোয়াট মামলা খারিজ হোক। স্লোগানে কেঁপে গেল দেশ। মাহফুজের উদ্দীপ্ত মুখে তাকিয়ে তখন রফিক বলেছিলেন— এখন পারবি তো ঢাকা ইউনিভার্সিটির পবিত্র মাটি থেকে আইয়ুবের কলঙ্কের বীজ তুলে ফেলে দিতে!

মাহফুজের সে উজ্জ্বল প্রদীপ্ত হাসি এখনো মনে করতে পারেন রফিক—পারব। সব পারব। সত্যকে কতদিন চাপা দিয়ে রাখা যায়। সত্য তো আগুন। আগুনের মতোই ঝলসে উঠেছিল মাহফুজ। আগরতলা মামলা উড়ে গেল স্লোগানের গর্জনে। পতন হলো আইয়ুব শাহীর! রেডিও, টিভিতে নতুন ক্ষমতা দখলকারী সেনাপতি অস্ত্র পিছে লুকিয়ে সাদা চেহারায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোষণা করল—আমি ইয়াহিয়া খান। আমি গণতন্ত্রের সেবক। অল্পদিনের মধ্যেই হবে সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেব ক্ষমতা।

সত্তরের প্রচণ্ড সামুদ্রিক ঝড়ে শকুনীরা খুবলে খেতে শুরু করল এদেশের বনি আদমের লাশ। পশ্চিমে তখন প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে নিমগ্ন ক্ষমতালোভী পশ্চিমা। কোনো রকমে দায়সারা সাহায্য আর সহানুভূতি পাঠিয়ে দিয়ে বসল আবার ভাগবাটোয়ারার নীলনকশার কাজে। এই বিশাল ভয়াবহ দুর্যোগে রাওয়ালপিন্ডির দিকে হাত তুলে মওলানা ভাসানী চিৎকার করে উঠলেন—তারা কেউ আসেনি আমাদের এই দুর্দিনে।

—সেদিন আমরা প্রথম নিজেদের যোগ্য প্রতিনিধি খুঁজেছিলাম। তারপর চেয়েছিলাম স্বাধীনতা।

কথাটা এখন একা একা অন্ধকারে মনে মনেই বললেন রফিক। ভেজা রাতের অন্ধকার কারাগারে বন্দি হয়ে আছেন তারা তিনজন। আর কেউ নেই। বাইরের ঝাপসা আলোর আভায় নিশ্চল হয়ে ফুটে আছে তিনটি মানুষ। হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে আছে রুনু। তার পাশে মাহমুদা। টুপটাপ বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। মাহমুদার দৃষ্টি এখনও বাইরে। এমন রাতে আসত মাহফুজ, জুয়েল, আজাদ, বাবুল।

হালকা শব্দ উঠত। খুব সাবধানে তাদের লুকিয়ে ফেলার অভ্যস্ততা আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন মাহমুদা। এখন নিঃশব্দে তারা আর আসে না। ষোলোই ডিসেম্বরে এসেছিলেন রফিক ক্যান্টনমেন্ট থেকে। আসেনি মাহফুজ, শফিক। মাহমুদা সাত মাসের হারুণকে রফিকের কোলে তুলে দিয়েছিলেন—ওরা কেউ আসেনি। যেদিন ওদের খবর এসেছে, সেদিনই এসেছেন হারুণ। রফিক সাহেব ছেলেকে কোলে নিয়ে বললেন,

—ওর নাম হোক স্বাধীন।

নামটা পছন্দ হয়নি মাহমুদার। হারুণ নাম তিনিই রেখেছিলেন।

দূর থেকে ভেসে এলো মোরগের ডাক। মুখ তুলল রুনু—ভোর হয়ে এলো বাবা।

—হু। অস্পষ্ট জবাব দিলেন রফিক।

—একবার কি যাবে মিনার বাড়িতে?

মাহমুদার বিষণ্ন কণ্ঠ ছুঁয়ে দিল রফিককে। জবাব দিলেন না রফিক। বুকের গভীরে সেই হালকা ব্যথাটা আরেকবার ঝিলিক তুলে মিলিয়ে গেল। উঠলেন তিনি। এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। মেঘেঢাকা আকাশ লুকিয়ে রেখেছে ভোরের আলোকে। এখনও অন্ধকার চারপাশে। রফিক সাহেবের মনে হলো, তিনি খুব একা। তার চারপাশে কেউ নেই, কিছুই নেই। বারান্দার রেলিংটাকে হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরলেন তিনি।

বারো

কুয়াশাভেজা রাতটি গম্ভীর তোপধ্বনি করে জাগিয়ে দিয়েছে সবাইকে অনেক আগেই। রফিক, শফিক, মাহফুজের মায়ের কান্না ক্লান্ত হয়ে এসেছে। তাকে ঘিরে রেখেছে নাতি-নাতনী আর দু'চারজন আত্মীয় পড়শী। রফিক ব্যস্ত। দুপুরে ফকির খাওয়ানো হবে। বাদ আছর মিলাদ। কয়েকজন ক্বারি কোরআন খতম করার জন্য কোরআন পড়া শুরু করেছেন বসার ঘরে। ঠিক তখনই এলো মিনা। সাদা শাড়ি পরে, হাতে একগোছা ফুল নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসে দাঁড়াল ঘরের দরজায়। রফিকের মা আবার নতুন আবেগে কেঁদে উঠলেন। মিনা দাঁড়াল তার পাশে—কাঁদবেন না মা। আজ ওরা আসছে।

রফিকের মা মানিকগঞ্জ থেকে এসেছেন কাল বিকেলে। এক বছর ধরে তিনি ওখানেই আছেন। মিনা আগে তাকে খালাম্মা বলে ডাকত। আজই প্রথম মা ডাকল।

মিনাকে বুকে জড়িয়ে আবার কাঁদলেন তিনি—আমার মাহফুজ বড় পছন্দ করত তোমাকে।

শফিকের বউ রিমি পাথর হয়ে বসে আছে। তাকে দেখালেন রফিকের মা— বল, কেমন করে ওর দিকে আমি তাকাব।

মাহমুদা এসে শান্ত করলেন শাশুড়িকে। মিনা উঠে দাঁড়াল। রিমিকে ডাকল—এস, আমরা ওঘরে যাই।

রিমি কাল রাতে এসেছে বাবার বাড়ি থেকে। শফিকের সঙ্গে বিয়ের পর মাত্র একটি মাস সে শফিকের সঙ্গে কাটিয়েছে। যুদ্ধের সময় মা-বাবার সঙ্গে চলে গিয়েছিল ভারতে। স্বাধীনতার পর ফিরেছে দেশে। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে আর ফেরেনি।

মিনা রিমির হাত ধরে পাশের ঘরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরেই মাহমুদা এলেন। নিচু গলায় রফিককে ডাকলেন—ওঘরে গিয়ে দেখ। মিনা রিমি দুটোই কেঁদে সারা হচ্ছে।

দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন রফিক। মাহফুজ আর শফিকের ছবির সামনে ফুল। আর দু'টি তরুণীর শোকার্ত কান্না তাঁর বুকে প্রচণ্ড আঘাত হয়ে ছুটে এলো। বসে পড়লেন রফিক। তখনই পাশের ঘর থেকে প্রচণ্ড শব্দে কেঁদে উঠল হারুণ। খাট থেকে গড়িয়ে পড়ে ব্যথা পেয়েছে। চমকে উঠলেন রফিক। কে কাঁদে! হারুণ! কোথায় সে! মেঘলা ভোরের ঘন আঁধার কেটে জেগে উঠেছে মোরগের আসন্ন দিনের ঘোষণা। রেলিং ধরা হাত বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে। হাত সরিয়ে নিলেন রফিক। এখন তার মনে পড়ল, পরের ষোলোই ডিসেম্বরে সাদা শাড়ি পরে মিনা একাই ফুল দিয়েছিল মাহফুজের ছবির সামনে। রিমি আসেনি। বিয়ে হয়ে নতুন স্বামীর সঙ্গে বিদেশে চলে গেছে সে।

রিমির বিয়ের পরই মারা গেলেন রফিকের মা। মিনার কান্নায় শরিক হবার লোক কমলো।

সেই ডিসেম্বরের পরেই রফিক বলেছিলেন—মিনা, তুই এবার বিয়ে কর।

রফিক জানতেন, মিনার মা-বাবা মিনার জন্য পাত্র খুঁজছেন। রফিকের কথায় মিনা ভীষণ কেঁদেছিল।

—ভাইজান, ও কথা আর আপনি কখনও বলবেন না আমাকে।

—কিন্তু তোর জীবন পড়ে রয়েছে সামনে। মাহফুজ তো আর ফিরবে না।

—কে বলেছে ও ফিরবে না। সারা বছর আমি ওর পথ চেয়ে থাকি। ডিসেম্বরের ষোলো তারিখে ও আসে। বলে যায়, সামনের ডিসেম্বরে আবার আসব। চিরকাল আসব!

পরের ডিসেম্বরের আগেই মিনা এলো। সঙ্গে ওর মা-বাবা। মিনার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে ডিসেম্বরের পয়লা সপ্তাহে। মা-বাবার সঙ্গে বিয়ের দাওয়াত দিয়ে গেল মিনা। যাবার সময় বলে গেল—ভাইজান! মাহফুজ চিরকাল আসবে। হয়তো হারিয়ে গেলাম আমি নিজেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরপর কোনো ডিসেম্বরের ষোলো তারিখে ফুল হাতে সাদা শাড়ি পরে মিনা আর আসেনি। এসেছে অন্য সময়। খোঁজ-খবর করেছে। আগের মতোই আন্তরিক হয়েছে। এখন ব্যস্ত ব্যবসায়ী, ঘর-সংসারী মিনা আসে না কিন্তু রফিক গেছেন মিনার বাড়ি। এখনও যেতে হয়।

—বাবা! রুনু এসে দাঁড়াল পাশে। মুখ ফেরালেন রফিক সাহেব।

—বাবা, মা কাঁদছে। বাবা, মিনা ফুপুর কাছে যাবে একবার?

—দেখি। ভোর হোক। এখনও তো অন্ধকার। উদ্দেশ্যহীনভাবেই কথাটা বললেন রফিক। ঠাণ্ডা বাতাসে শীত করছে তাঁর। হঠাৎ করেই বললেন—রুনু, ঝুনুটা চিঠি লেখে না অনেকদিন, তাই না রে!

—নাঃ। মাথা নাড়ল রুনু।

ঝুনু ওর বাচ্চা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে আবুধাবিতে আছে। গত বছর এসেছিল ছুটিতে। হারুণের চালচলনে চিন্তিত হয়ে বলেছিল—ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই। দরকার নেই পড়ালেখার। ওখানেই চাকরি-বাকরি করুক।

রাজি হননি রফিক সাহেব। গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রিটা এখনও হয়নি যার, সে কি চাকরি করবে বিদেশে! কেন রাজি হননি রফিক। তিনি কি ভেবেছিলেন, হারুণ ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ভারি ওজনের ডিগ্রি নিয়ে ফেলবে! বোঝেননি কেন, হারুণ ডিগ্রির গন্তব্যে পৌঁছানোর রাস্তা পাশ কাটিয়ে অন্য রাস্তায় চলে গেছে। শফিক আইএসসি পাস করে আর্মিতে গিয়েছিল —সে দুঃখ অনেকদিন ভুলতে পারেননি রফিক। মাহফুজ ভালো ছাত্র ছিল। সিএসএসের জন্য তৈরি হতে হতে থেমে গেল। হারুণকে দিয়েই হয়তো ডিগ্রির মোহর অপূর্ণতা পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন।

—বাবা, মিনা ফুপুই তো হারুণকে নিয়ে গিয়েছিল। হারুণের জন্য তার তো কিছু করা উচিত।

থমকে গেলেন রফিক। যে সত্যি কথাটা অনবরতই মনে হুল ফোটায়, যে সত্যি কথাটা তিনি নিজে কখনও মুখ ফুটে বলতে পারেন না, সে কথা রুনু কত অনায়াসে উচ্চারণ করল!

যেন মেয়েকেই খুশি করছেন এমনভাবে বললেন—দেখি, বলব মিনাকে। আর দেখা যাক, হারুণকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঝুনুর কাছে পাঠিয়ে দেয়া যায় কি না।

অস্ফুট শব্দে হেসে ফেলল রুনু।

—হাসছিস যে!

—হাসি পাচ্ছে তোমার কথা শুনে। আমি জানি, ওসব কিছুই তুমি পারবে না। রুনুর সামনে রফিক সংকুচিত বোধ করলেন। হতাশ মানুষের যুক্তি খোঁজার মতো করে বললেন—তখন যদি হারুণকে নিয়ে মিনার কাছে না যেতাম! এত বড় ভুলটা যে কেমন করে হলো।

কথাটা বলেই ভাবলেন রফিক। সত্যিই কি তিনি ভুল করেছিলেন! কিন্তু তখন তো মনে হয়নি তিনি ভুল করছেন। কেমন করে মনে হবে। অন্য কারো কাছে নয়, তিনি তো মিনার কাছেই গিয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় বিভাগে পাস করা হারুণের ভর্তি নিয়েই ছিল সমস্যা। মিনাকেই অনুরোধ করেছিলেন রফিক। মিনা দায়িত্ব নিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বলেছিল—ভাইজান, আজকাল পিছনে কোনো দলের জোর থাকলে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি, হলে সিট পেতে সুবিধে হয়। আমি আমার ভাসুরকে বলে দেখব।

মিনার ইঙ্গিতের পরও রফিক সাহেব চিন্তিত হননি, পিছিয়ে যাননি। জোরালো করে বলতে পারেননি—দরকার নেই কোনো দলের মুরুব্বিয়ানার।

বরং তিনি খুশি হয়ে বলেছিলেন—দেখ, বলে যদি কিছু করা যায়। লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেলে বসে বসে করবে কী ছেলেটা!

হারুণকে নিয়ে মিনার সঙ্গে মিনার ভাসুরের বাড়িতে গিয়েছিলেন রফিক। খুব আত্মপ্রসাদে মিনার ভাসুরকে বলেছিলেন—আমার এই ছেলেটির জন্ম একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময়। যেদিন ওর জন্ম হয়—সেদিন আমার ছোট ভাইটা শহীদ হয়।

এখন কি মিনাকে বলা যায়—তোমার হারুণের জন্য কিছু করার ছিল, কিছু করার আছে!

অসহায়ের মতো মেঘাচ্ছন্ন আকাশেই প্রশ্নটা পাঠালেন রফিক। সেখানে এখনও ভোরের আলো স্পষ্ট হয়ে ফোটেনি।

তেরো

মাহমুদা হেঁটে এলেন হারুণের ঘরে। আলো জ্বালালেন। নিভাঁজ বিছানা। গোছানো জামাকাপড়, হারুণের প্রসাধনী, টুকটাক জিনিসপত্র দপ করে জীবন্ত হয়ে উঠল তার সামনে। ওই তো অ্যাশট্রেতে আধখাওয়া সিগারেট মুখ গুঁজে আছে। এইমাত্র বুঝি হারুণ বেরিয়েছে এ ঘর থেকে। রান্নাঘরে এলেন মাহমুদা। রান্নাঘরের সঙ্গেই ছোট্ট করিডোরে খাবার টেবিল। হারুণের প্লেট, গ্লাস গুছিয়ে রেখেছেন যেমন, তেমনি আছে। আজই অনেকদিন পরে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলেছিল হারুণ,

—মা, বড় খিদে পেয়েছে। ভাত দাও।

—এই তো বাবা রান্না হয়ে গেল। যা, তুই গোসল কর...

রান্না শেষ হবার আগেই হারুণ বেরিয়ে গিয়েছিল। কেন মাহমুদা তখন ফেরাননি হারুণকে! হারুণ তো ফিরতে চেয়েছিল। খাবার টেবিল আঁকড়ে মাহমুদা তাকালেন হারুণের ঘরের দিকে। ওই ঘর তিনি হারুণের জন্য নিরাপদ ভেবেছিলেন। কিন্তু এত বড় ভুল তিনি কেমন করে করলেন! কাল সকালে সেই আগের মতো উদ্‌ভ্রান্ত চেহারায় ফিরেছিল হারুণ। মুখ-চোখ ফোলা, কপালে কালসিটের দাগ, জামায় রক্ত। ছেলের ভাঙাচোরা হতচ্ছাড়া চেহারা একটুও মমতা জাগায়নি। মাহমুদা ঠাণ্ডা শক্ত গলায় হারুণকে প্রশ্ন করলেন—আজো কি পুলিশ আসবে?

হারুণ বিছানায় বসে হাঁফাচ্ছে। মনে হয় প্রচণ্ড রোদ মাথায় নিয়ে দীর্ঘপথের ম্যারাথন রেস শেষ করে এলো। দুর্বল হলেন না মাহমুদা—কী রে, কথা বলছিস না কেন?

লাল চোখে রাগী চেহারায় ঝাড়া দিয়ে মুখ ফেরালো হারুণ—কী বলব? কী শুনতে চাও?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—শুনতে চাই, আজো কি পুলিশ আসবে?

—জানি না।

—কেন জানবি না। তুই কি করেছিস তা তুই না জানলে আর কে জানবে!

বিকট চিৎকার করে উঠল হারুণ—যাও তুমি, সরে যাও। কাউকে সহ্য করতে পারি না আমি। কাউকে না।

মাহমুদা ভয় পেলেন না। সরলেন না। এগিয়ে এসে হাত ধরলেন হারুণের। স্থির দৃষ্টি দিয়ে বিঁধলেন হারুণকে—বল, তুই কী করেছিস? তুই কি মানুষ খুন করেছিস? বল, কাকে খুন করেছিস? কেন খুন করেছিস?

হারুণের হাত ধরে উন্মাদের মতো ঝাঁকুনি দিতে দিতে চিৎকার করে উঠলেন মাহমুদা। তার সারা শরীর কাঁপছে। যেন তিনি পাগল হয়ে গেলেন। যেন তিনি তার নিজের সন্তানকেই খুন করতে উদ্যত হয়েছেন।

মায়ের চেহারায় তাকিয়ে ভয় পেল হারুণ। তার বেপরোয়া, উদ্ধত ভঙ্গিটি দুর্বল হয়ে ভেঙে গেল।

— আমি জানি না। আমি সত্যিই জানি না, আমি কি করেছি।

মাহমুদা আগের মতোই উন্মাদ ভঙ্গিতে খামচে ধরলেন হারুণের কাঁধ—তোকে বলতেই হবে। বলতেই হবে কাকে খুন করেছিস।

—মা!

হারুণের ডাক আর্তনাদ হয়ে ধাক্কা দিল মাহমুদাকে। কঠিন হাতের মুঠি খুলে গেল। ঝুলে পড়ল তার হাত। তখনই মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল হারুণ— আমি খুন করেছি। আমি খুন করেছি মা। নিজেকে খুন করেছি মা। প্রচণ্ড আবেগে মায়ের বুকে মুখ রেখে কেঁদে উঠল হারুণ—আমি যে আর পারছি না! তুমি আমাকে তোমার বুকে লুকিয়ে রাখ মা।

ছেলেকে বুকে জড়িয়ে নতুন এক ভয়ে হিম হয়ে গেলেন মাহমুদা। তার উনিশ বছরের ছেলেটি পাঁচ বছরের শিশু হয়ে আশ্রয় খুঁজছে মায়ের বুকে। কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে। ওর ভেঙে পড়া ক্লান্ত দিশেহারা শরীর মায়ের বুককে হাজার বুলেটে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে। দিশেহারা চোখে চারদিকে তাকালেন মাহমুদা। কোথায় লুকিয়ে রাখবেন তার সন্তানকে তিনি। কোথায় খুঁজবেন নিরাপদ আশ্রয়।

বুক কাঁপিয়ে নেমে এলো কান্না। হারুণকে বুকে জড়িয়ে অনেকক্ষণ কাঁদলেন মাহমুদ। তারপর খুব আস্তে হারুণের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন—কাঁদিস না বাবা। এসব ছেড়ে দে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

মুখ তুলল হারুণ। ভয় পাওয়া অসহায় শিশুর মতো আঁকড়ে থাকল মায়ের হাত। বিষণ্ন ভেজা চোখে তাকাল মায়ের দিকে—কেমন করে ফিরব মা, আমি যে জানি না!

—ওদের মধ্যে তুই আর যাস না।

—তাহলে যে আমি প্রাণে বাঁচব না!

আবার দু'হাতে হারুণকে বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন মাহমুদা—কে বলল বাঁচবি না। আমি তোকে বাঁচাব। কেউ পারবে না তোকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাতে শান্ত হয়ে ঘুমোলো হারুণ। দিনেও ঘরেই ছিল। দুপুরে এলো একটা গাড়ি, কয়েকজন যুবক। মাহমুদা তখন রান্নাঘরে। যখন তিনি ঘরে এলেন, হারুণ নেমে যাচ্ছে।

—হারুণ! পেছন থেকে ডাকলেন মাহমুদা।

—কোথায় যাচ্ছিস হারুণ? ভাত খাবি না!

—আসছি মা। এখুনি ফিরব। তুমি আমার খাবার দিয়ে রেখ।

—তাড়াতাড়ি ফিরিস বাবা।

মুখ ফেরাল হারুণ—চিন্তা কোর না মা। আজ আমি ঠিকই ফিরে আসব।

টেবিলে মাথা রেখে কেঁদে উঠলেন মাহমুদা। ওঘর থেকে রুনু ছুটে এলো— মা, মা, কেঁদো না মা। ওঠো। এ ঘরে এস।

রুনুকে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মাহমুদা—সর, সরে যা। আমি একাই যাব হারুণকে খোঁজ করতে। তাকে আমি ফিরিয়ে আনব। মাহমুদার উদ্‌ভ্রান্ত চেহারায় ভয় পেল রুনু।

—কোথায় যাবে মা তুমি?

—সব জায়গায়। থানায়, হাসপাতালে, রাস্তায়। রুনুকে ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ির দিকে হেঁটে গেলেন মাহমুদা।

রফিক সাহেব এসে মাহমুদার হাত ধরলেন,

—পাগলামি কোর না মাহমুদা। ও তো এরকম কত রাত বাড়ি ফেরেনি। তখন তুমি তো এমন করনি। আজ কেন করছ?

সিঁড়ির সামনে লুটিয়ে বসে পড়লেন মাহমুদা। শোকার্ত মায়ের মতো কেঁদে উঠলেন— আজ যে সে ফিরতে চেয়েছিল। বাঁচতে চেয়েছিল।...

হঠাৎ করে অন্ধকার ফিকে হয়ে গেল। বৃষ্টিভেজা বাতাসে কেঁপে কেঁপে ভেসে এলো ভোরের আজান।

চৌদ্দ

নামাজ শেষ করে আলনা থেকে পাঞ্জাবি টেনে নিলেন রফিক। মাহমুদা জায়নামাজে পড়ে আছেন। রুনু এখনও দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। ওকেই ডাকলেন রফিক—রুনু। আমার ছাতাটা দে।

শুকনো মুখে ছাতা এগিয়ে দিল রুনু। সিঁড়িতে পা বাড়াতেই রুনুর পেছন থেকে ডাক —বাবা! আমি কি আসব সঙ্গে?

মেয়েকে দেখলেন রফিক। আঁধারে স্পষ্ট হয়ে মিশে আছে রুনু। যেন এখুনি অদৃশ্য হয়ে যাবে। বুক লাফিয়ে উঠল ভয়ে। ফিরে এলেন রফিক। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করলেন মেয়েকে—তুই থাক। কথাটা বলেই ভয় পেলেন! তিনি কি ভাবছেন হারুণ নেই।

ভয়টাই তাকে তাড়িয়ে বের করল পথে। নোংরা কাদা উপচানো গলির মতোই ভোরটা নোংরা, ঘোলাটে। ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি ঝরছে। দু'একটা রিক্‌শা ঘণ্টা বাজিয়ে চলে গেল। ভোরের ট্রেন অথবা লঞ্চের যাত্রী নিয়ে এলো হয়তো। গলির মুখে নোংরা ডাস্টবিনের পাশে খালি রিক্‌শার জন্য দাঁড়ালেন রফিক। ডাস্টবিন ধুয়ে নোংরা পানির তোড় নামছে পথে। উচ্ছিষ্ট কুড়ানো ভিখিরী মানুষটি এখনও বসে আছে। তার পাশে একদল কুকুর ভিজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিজে আবর্জনা ঘাঁটছে। পর্দাঢাকা একটা রিক্‌শা এগিয়ে এলো। হাত তুললেন রফিক,

—অ্যাই। অ্যাই খালি।

রিক্‌শাটা থামল ঠিক রফিক সাহেবের সামনেই। পর্দা সরে গেল। একটি যুবক লাফিয়ে নামল রিক্‌শা থেকে। ধক্ করে উঠল বুক। পাঞ্জাবির কোনায় চশমার ভেজা কাচ মুছে নিলেন রফিক। হাত তুলে ডাকলেন—হারুণ, হারুণ, এই যে আমি এখানে।

অন্য এক যুবক এলোমেলো পায়ে ভয়ার্ত ভঙ্গিতে এসে দাঁড়িয়ে গেল রফিকের সামনে —আপনি এখানে! আমি তো আপনার বাড়িতেই যাচ্ছিলাম।

—তুমি কে! তোমাকে তো চিনতে পারছি না। চশমার কাচ আবার মুছলেন রফিক।

—আমি হারুণের বন্ধু। হারুণের খবর নিয়ে এসেছিলাম।

ভেজা বাতাস শীতল স্পর্শে কাঁপিয়ে দিল হঠাৎ রফিককে। অস্পষ্ট জড়ানো কণ্ঠে বললেন—কী খবর হারুণের? কোথায় সে? যুবকটি মুখ ঘুরিয়ে তাকাল ডাস্টবিনে। তারপর বলল—হারুণ কাল রাতে খুন হয়েছে। মুহূর্তে অচেনা যুবকের মুখ, বৃষ্টিঝরা ময়লা ভোর, দুর্গন্ধময় ডাস্টবিন অদৃশ্য হলো। বুকের প্রচণ্ড ব্যথার ঝাপটায় বাঁকা হয়ে গেলেন রফিক। বসে পড়লেন। অনেকক্ষণ পরে মুখ তুললেন। তার পাশে কেউ নেই। কখন যেন চলে গেছে ছেলেটি। বৃষ্টিভেজা ঘোলাটে ভোরে নোংরা পানি আর কাদায় বসে আছেন তিনি। সামনে পড়ে আছে একটা মরা বেড়ালের বাচ্চা। উঠে দাঁড়ালেন রফিক। তাকে যেতে হবে হারুণের লাশ আনতে।

সারাদিন হাসপাতালের মর্গের সামনে বসে থাকলেন রফিক। হারুণকে নিয়ে যেতে হবে বাড়ি। লাশ পাওয়া গেল না। হেঁটে হেঁটে বৃষ্টিতে ভিজে মিনার বাড়িতে এলেন। এসে দাঁড়ালেন মেহমানে গমগমা বসার ঘরের দরজার সামনে।

গতকাল রাতের সংঘর্ষের খবর ছড়িয়ে গেছে শহরে। খবর কাগজের প্রথম পাতায় বড় বড় হেডিংয়ে উঠেছে আহত নিহতের খবর নিয়ে সন্ত্রাসের সংবাদ। সেটা নিয়েই তুমুল আলোচনা চলছে মিনার বসার ঘরে। ট্রলি থেকে চা বিলি করছে মিনা। মেহমানদের দামি সিগারেটের ধোঁয়া ঘিরে রেখেছে ওকে। মিনার মুখটা স্পষ্ট করে দেখতে পেলেন না রফিক।

দরজার কাঠে হাত রেখে ভাঙা গলায় অপরিচিত মানুষের মতো ডেকে উঠলেন—মিনা। মিনা আমি এসেছি।

মুহূর্তে নিস্তব্ধ হলঘর। সবার দৃষ্টি রফিকের দিকে। অবিশ্বাস্য, অপ্রত্যাশিত কেউ যেন এসে দাঁড়িয়েছে। মিনা এলো—ভাইজান, আপনি!

মিনার স্বামী দেলোয়ার উঠে এলো—কখন এলেন?

রফিক জবাব দিলেন না। তার শূন্য দৃষ্টি মিনার নিশ্চিন্ত ঘরে। মিনার ছেলেমেয়ে ছুটিতে মা-বাবার কাছে ফিরেছে। ওরা দাঁড়িয়ে আছে বাবার পাশে। রফিকের নীরবতা অস্বস্তি আর বিব্রতকর বাতাসের ঝাপটা দিচ্ছে সবাইকে। দেলোয়ার কথা খুঁজে না পেয়েই যেন বলল,

—আমি অনুমান করছিলাম এমন কিছু হবে। হারুণ ইদানীং কোনো কিছুই মেনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলছিল না। ভীষণ বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল।

মিনা ডাকল—ভাইজান, চলুন ওঘরে বসবেন।

রফিককে পাশের ঘরে বসালো মিনা। আশঙ্কিত প্রতীক্ষায় তাকাল রফিকের দিকে। যেন রফিক এখনই চিৎকার করে মিনা আর তার ভাসুরকে দোষারোপ করবেন।

—মিনা। মুখ তুললেন রফিক। তার দু'চোখে ভিক্ষুকের করুণ অনুনয়— মিনা, আমি হারুণের লাশ ফেরত চাইতে এসেছি।

জবাব দিল না মিনা। রহস্যজনকভাবেই চলে গেল পাশের ঘরে। ফিরল তখনই। দাঁড়াল রফিকের সামনে।

—ভাইজান! হারুণের লাশ এখন পাওয়া যাবে না। আমার ভাসুর জানিয়েছেন, লাশ নিয়ে মিছিল হবে... জানাজা হবে...। উঠে দাঁড়ালেন রফিক। বিকার তাড়িত পা ফেলে হাঁটলেন খুব এলোমেলো আর তাড়াতাড়ি। যেন চারপাশে ডাস্টবিন। দুর্গন্ধে দম আটকে আসছে তার।

মিনা পেছন থেকে ডাকল—ভাইজান। হারুণের লাশ বাড়িতে এলে আমি আসব দেখতে।

দাঁড়িয়ে গেলেন রফিক—লাশ আসবে? কখন আসবে? কবে আসবে?

মাথা নিচু করল মিনা—আমি জানি না।

পনের

শূন্যতায় হাহাকারে নিস্তব্ধ হয়ে আছে বাড়ি। মাহমুদা পড়ে আছেন বিছানায়। দু'চারজন পড়শী এসেছিল শোকার্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে। তারাও চলে গেছে। রুনু বোবা হয়ে বসে আছে বিছানায়, মায়ের পাশে। থেকে থেকে উঠে বসছেন মাহমুদা। প্রলাপ বকছেন—কে আসছে, হারুণ! আসেনি? কখন আসবে... কখন আসবে হারুণ! রফিক সাহেব উঠলেন! কোরআন শরীফ খুঁজলেন। ওপরতলা থেকে বাড়িওয়ালার মেয়ে এলো। আটটার খবরে হারুণের লাশ দেখা গেছে টিভিতে। বলল,

—এখন রাত দশটায় খবর শুরু হবে। আপনারা কি আসবেন দেখতে?

উঠে বসলেন মাহমুদা—কোথায় হারু! কখন আসবে? আমি যাব তার কাছে।

খুব শান্ত স্থিরভঙ্গিতে স্ত্রীর হাত ধরলেন রফিক—চল। হারুণকে দেখবে চল। এখনই সে আসবে।

বুকে ঝাপটা মারল ব্যথা। ব্যথাটা হারুণের জন্য। রফিক সাহেবের মনে হলো, কত বছর যেন ছেলেটাকে দেখেননি তিনি।

রুনু মাকে ধরে ধরে নিয়ে এলো ওপরতলায়। রফিক সাহেব এলেন তার পিছে। টিভি খবরের প্রারম্ভিক সঙ্গীত শুরু হয়ে গেছে।

সবক'টা জানালা খুলে দাও না...

ওরা আসবে...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চমকে উঠলেন রফিক... কে আসবে! হারুণ!

যারা এই দেশটাকে

ভালোবেসে দিয়ে গেল প্রাণ।

—কোথায়? কোথায় হারুণ?

রফিকের বিভ্রান্ত দৃষ্টি তন্ন তন্ন করে খুঁজছে সামনে।

—বাবা, মা তাকিয়ে দেখ ওই যে... ওই তো হারুণ। রুনু ফুঁপিয়ে উঠল। কোথায় হারুণ। হারুণকে তো খুঁজে পাচ্ছেন না রফিক। কে আসছে! কারা আসছে! মাহফুজ, জুয়েল, বাকি, বাবুল, আজাদ। ওই তো ওরা আসছে। যারা এই দেশটাকে ভালোবেসে দিয়ে গেল প্রাণ...।

হারুণ তো আসে না। টোকা, মাইদু, দিলু ওদের মতো হারুণও তো আর আসে না। আসবে না। কোনোদিন আসবে না। মাহমুদা ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

—ফিরিয়ে দাও। আমার হারুণকে আমার বুকে ফিরিয়ে দাও।

ভূমিকম্পের উন্মূল গাছের মতো দুলে উঠলেন রফিক। চিৎকারে কাঁপিয়ে তুললেন সবাইকে।

—খুলে দাও। সবক'টা জানালা খুলে দাও। ফিরে আসতে দাও হারুণকে! ভাঙা জাহাজের মতো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলেন রফিক। চিৎকার কান্না হয়ে গেল— হারুণ। আমার একমাত্র ছেলে হারুণ।

মাটিতে গড়িয়ে পড়া তার দেহ নিঃশব্দ হয়ে গেল।

বাইরে গুম গুম শব্দে হুঙ্কার দিল মেঘ। ভেজা গলির অন্ধকার বৃষ্টির ধারালো আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হলো। ডাস্টবিনের পাশে আগের মতোই ভিজতে থাকল মানুষ, কুকুর আর মরা বেড়াল।

=০০০=

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~